অবাক সেনাপতি

মোশাররফ হোসেন খান

অবাক সেনাপতি

মোশাররফ হোসেন খান

এ গ্রন্থে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে চমৎকারভাবে সাজিয়ে গল্পাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যোগাযোগ পাবলিশার্স

www.pathagar.com

অবাক সেনাপতি : মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশক : পরিচালক, যোগাযোগ পাবলিশার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৫ই অক্টোবর, ২০০২
© : লেখক
প্রচ্ছদ : সুখেন দাস
কম্পিউটার কম্পোজ : রহমত কম্পিউটার্স
মুদ্রণে : আল মানার প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

Abak Senapoti : Mosharraf Hossain Khan
Published By Jugajog Publishers
34, North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100
First Edition : 15 November 1999
Taka Fifty

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা

ডাঃ এম. এ. ওয়াজেদ খান

আম্মা

মিসেস কুলসুম বেগম

কে

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

প্রবন্ধ

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জীবন বীমা/সৈয়দ সরওয়ার সিদ্দিকী/১০.০০

উপন্যাস

দুঃস্বপ্নের কালরাত্রি/নিজাম সিদ্দিকী/৫০.০০
মনের মানুষ/নিজাম সিদ্দিকী/৫০.০০
প্রথম প্রেম/নিজাম সিদ্দিকী/১০০.০০

কিশোর উপন্যাস

মায়ের আদর/নিজাম সিদ্দিকী/৫০.০০

কিশোর গল্প

অবাক সেনাপতি/মোশাররফ হোসেন খান/৫০.০০

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে
ক্রীতদাসের চোখ

গল্প

প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান

সম্পাদনা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

কিশোর উপন্যাস

বিপ্লবের ঘোড়া

কিশোর গল্প

সাহসী মানুষের গল্প
বিস্ময়কর বিজয়
রহস্যের চাদর

জীবনী

হাজী শরীয়তুল্লাহ

www.pathagar.com

গল্পসূচি

অবাক সেনাপতি	৭
পরীক্ষার আগুন	২০
দুঃসাহসী স্বর্ণঈগল	২৬
বিরল পুরস্কার	৩২
শহীদী কাফেলায় সাহসী কবি	৩৯
গোসল দিলেন ফেরেশতারা	৪৭
সেই যে শিকারি	৫২
চোখ তো নয়, অলৌকিক আয়না	৫৯
ফাঁসির মঞ্চে হাসেন তিনি	৬৪
বিরল পুরুষ শক্ত খিলান	৬৯
দুধ সাগরে দুরন্ত নাবিক	৭৫

www.pathagar.com

অকৃতজ্ঞ হয়ে যাই আমি, সুখ দেখে বার বার
মানুষ গগণ তুল্য তার মন বোঝা বড় ভার।
—নিজাম সিদ্দিকী

পাথরে পারদ জ্বলে জলে ভাঙে ঢেউ
ভাঙতে ভাঙতে জানি গড়ে যাবে কেউ।
—মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

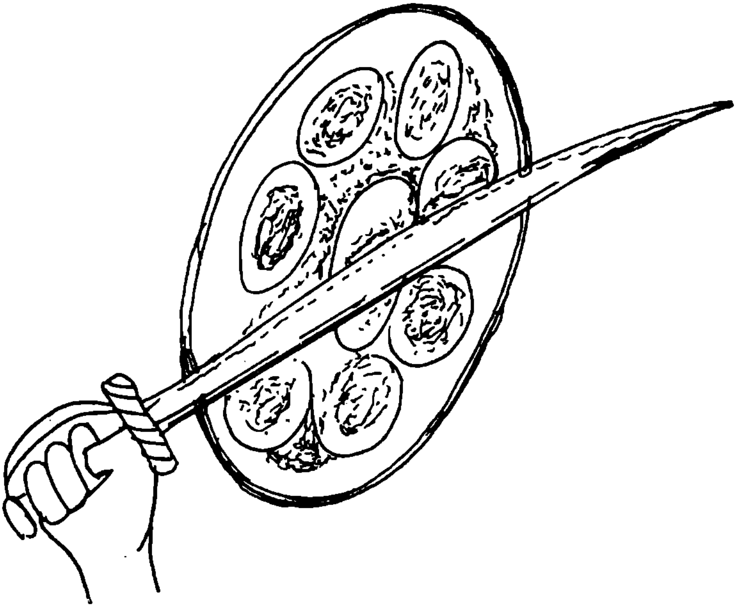

অবাক সেনাপতি

এক

কুরাইশদের বুকে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন।

কিছুতেই ভুলতে পারছে না তারা বদরের পরাজয়ের গ্লানি। ভাবতে পারছে না, কিভাবে এটা সম্ভব হলো ?

মাত্র তিনশো চৌদ্দ জনের কাছে এক হাজারের এক বিশাল সুসজ্জিত বাহিনীর পরাজয় তাদেরকে ফেলে দিয়েছে বিস্ময়ের গভীরে।

বদরে পরজায়ের পর বল্লম বিদ্ধ হরিণের মতো কেবল অস্থিরভাবে ছুটতে থাকে দুর্ধর্ষ কুরাইশরা। একটি যন্ত্রণার কাঁটা বিধে গেল তাদের শক্ত পাঁজরে।

অন্ধকার জমাট হয়ে এলো তাদের সামনে।

ইবলিস ভাবলো এই তো সঠিক সময়!

অন্ধকারের কালো পর্দা ফুঁড়ে ইবলিস তাদেরকে প্ররোচিত করে তুললো পুনর্বার।

www.pathagar.com

তারা চলে গেল আবু সুফিয়ানের কাছে। বললো, 'আপনিই আমাদের এখন দলনেতা।

বদর যুদ্ধে আমাদের অনেকেই পিতা, সন্তান, ভাই হারিয়েছে। এর প্রতিশোধ না নিলে আমরা ঘুমুতে পারবো না।

স্বস্তি নেই আমাদের বুকে। আপনার কাছে আছে আমাদের গোত্রের ব্যবসার সম্পদ। সেগুলো দিয়ে দিন আমাদের। সেসব খরচ করবো যুদ্ধের জন্যে।

আমরা পুনর্বার মুখোমুখি হতে চাই মুহাম্মাদের। প্রতিশোধ নিতে চাই আমরা—উত্তম প্রতিশোধ।'

প্রসারিত হয়ে উঠলো আবু সুফিয়ানের কপালের ভাঁজ।

তার চোখের পাঁপড়িতে লাফিয়ে উঠলো সম্ভাবনার বিদ্যুৎ। নেতৃত্বের চুম্বকে টেনে নিল তাকে সামনের দিকে। বললো, 'হ্যাঁ! প্রতিশোধই আমাদের একান্ত কাম্য। সুতরাং চলো মদীনার দিকে।'

মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গেল কুরাইশদের বিশাল এক বাহিনী।

সমর সাজে সজ্জিত তারা।

সাথে আছে হিন্দাসহ আরো কয়েকজন মহিলা। তাদের কাজ—যোদ্ধাদেরকে সজীব ও সতেজ রাখা।

এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি কুরাইশদের বুদ্ধিমান ও সাহসী যোদ্ধা আবু সুফিয়ান।

প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে কুরাইশরা যাচ্ছে মদীনার দিকে।

মুহাম্মাদ (সা)-এর মুখোমুখি হতে।

দুই

সর্বদা উৎকর্ণ থাকে মুহাম্মাদ (সা)-এর কান। তিনি চারপাশে শুনতে পান ফিসফাস আওয়াজ।

কিসের আওয়াজ?

সুদূর থেকে ভেসে আসছে যুদ্ধবাজ কুরাইশদের অশ্বের খুরধ্বনি।

তাদের উট এবং ঘোড়াগুলোও প্রস্তুত নয় সত্যের বিপক্ষে দাঁড়াতে।

পশুগুলোর হ্রেষাধ্বনিতে ভেসে আসছে এক মহাবিদ্রোহের সরব চিৎকার। যে চিৎকারের ভাষা বুঝতে পারে না আবু সুফিয়ান।

www.pathagar.com

কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) বোঝেন। তিনি বুঝতে পারেন কুরাইশদের উট এবং ঘোড়াগুলো তাদেরকে বহন করছে বাধ্য হয়ে। পশুগুলোর হাঁটার ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে অনিচ্ছার ত্রুটিপূর্ণ ছন্দ।

তবুও তারা এগুচ্ছে।

তারা আসছে কুরাইশদের বহন করে মদীনার দিকে। পশুগুলোর পিঠের ওপর পাপের বোঝা।

তারা এখন বাতনুস সুবখার পাহাড়ের কাছে। অবস্থান করছে সেখানে কুরাইশরা যোদ্ধার ভঙ্গিতে।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশে একত্রিত হলেন তাঁর বিশ্বস্ত সাথীরা।

গোল হয়ে বসলেন নক্ষত্রেরা। মাঝখানে প্রদীপ্ত সূর্য—নবী মুহাম্মাদ (সা)।

চার পাশ নীরব-নিস্তব্ধ। তাঁদের চাহনীতে নির্দেশ পালনের সম্মতি।

সহসা বাতাস ছুঁয়ে গেল সকলের মস্তক।

নক্ষত্রেরা নড়েচড়ে বসলেন। তাকালেন সূর্যের দিকে। সম্ভবত কিছু বলবেন আলোকের সভাপতি।

রাসূল (সা) তাকালেন সাথীদের দিকে। তাঁর চোখের দ্যুতিতে হীরকের গুঁড়ো। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে অমূল্য বিদ্যুৎ। এবার নড়ে উঠলো তাঁর সুস্থির ঠোঁট। বিশুদ্ধ তাঁর ভাষা। ধীর লয়ে রাসূল (সা) বললেন, 'আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।'

সাথীদের চোখে মুখে জিজ্ঞাসার বৃষ্টি।

রাসূল (সা) বুঝলেন সেটা। বললেন, 'দেখলাম, আমার একটি গরু জবাই করা হয়েছে। আর আমার তরবারির ধারালো প্রান্তে যেন ফাটল ধরেছে।'

চমকে উঠলেন সকল সাহাবী! বিস্ময়ে তাকালেন তারা রাসূল (সা)-এর দিকে।

রাসূল (সা) আবারো বলে চললেন, 'আরো দেখলাম, আমি একটি সুরক্ষিত বর্মের ভেতর হাত ঢুকিয়েছি। এই বর্ম দ্বারা মদীনাকে বুঝেছি। তোমরা যদি মনে করো মদীনায় অবস্থান করবে এবং কুরাইশরা যেখানে অবস্থান করছে, সেখানে থাকাকালেই তাদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেবে– তাহলে সেটা করতে পারো। তারপরও যদি তারা ওখানেই অবস্থান করে,

www.pathagar.com

তাহলে সেটা হবে তাদের জন্যে খুবই খারাপ অবস্থান। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে মদীনায় বসেই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।'

রাসূল (সা)-এর উচ্চারণে সাথীরা বুঝতে পারলেন কুরাইশদের অবস্থানের কথা। বুঝতে পারলেন রাসূল (সা)-এর অভিমতের কথা। তবুও পরামর্শ চাইলেন রাসূল (সা)।

কয়েকজন সাহাবী অভিমত দিলেন তাদের বিবেচনার সপক্ষে। বললেন, 'দরকার নেই মদীনার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আমরা এখানে থেকেই যুদ্ধ করবো কুরাইশদের সাথে।'

উন্মুক্ত পরিবেশ।

যে কেউ ব্যক্ত করতে পারেন তার ব্যক্তিগত অভিমত। বাক স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন না একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি।

রাসূল (সা) শুনলেন এক পক্ষের কথা। এবার তাকালেন অন্য পক্ষের দিকে।

এতোক্ষণ যারা ছিলেন নীরব শ্রোতা, রাসূল (সা)-এর সম্মতি পেয়ে এবার তাঁরা নড়ে উঠলেন। বললেন, 'হে রাসূল! আমরা চাই মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে। আমাদেরকে বাইরে নিয়ে চলুন। আমরা শত্রুর মোকাবেলা করবো জীবন বাজি রেখে। কুরাইশরা যেন বুঝতে না পারে যে আমরা দুর্বল কিংবা কাপুরুষ হয়ে গেছি।'

মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চান--তাদের সংখ্যা অধিক। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে শ্রদ্ধা জানালেন রাসূল (সা)।

তিনি দ্রুত প্রবেশ করলেন নিজের ঘরে এবং একটু পর বেরিয়ে এলেন যুদ্ধের পোশাক পরে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন সাহাবীরা রাসূল (সা)-এর দিকে।

দিনটি ছিল জুমআর দিন।

রাসূল নামাজ আদায় করলেন। তারপর সমবেত মুসলিম জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রণসাজে সজ্জিত সেনাপতি— মুহাম্মাদ (সা)।

রাসূল (সা) চেয়েছিলেন মদীনায় থেকে কুরাইশদেরকে মোকাবেলা করতে। কিন্তু সাহাবীদের একাংশ চাইলেন যুদ্ধের জন্যে মদীনার বাইরে যেতে।

www.pathagar.com

যাঁরা পরোক্ষভাবে রাসূল (সা)-এর অভিমতের বিপক্ষে ছিলেন–তাঁরা অনুতপ্ত হলেন। বললেন, 'হে রাসূল! আপনার মতকে পছন্দ না করে আমরা অন্যায় করেছি। আপনি যদি মদীনাতেই অবস্থান করতে চান, তবে তাই করুন।'

স্মিত হেসে উঠলেন রাসূল (সা)। বললেন; 'না! তা আর হয় না। যুদ্ধের পোশাক পরার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোনো নবীর পক্ষে শোভানীয় নয়।'

সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা)।

নির্দেশ পালনে তৎপর হলেন সকল মুসলিম সৈনিক।

শুরু হলো যুদ্ধযাত্রা।

এক হাজারের একটি সুসজ্জিত সৈনিক বহর নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চললেন রাসূল (সা)।

ক্রমাগত সম্মুখে।

তারা তখন মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী শাওত নামক স্থানে।

এ সময়ে দ্বিধার তরঙ্গে ভেসে উঠলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল।

সে বললো, 'মদীনার বাইরে আসতে নিষেধ করেছিলাম আমি। রাসূল (সা) আমার কথা শুনলেন না। হে জনতা! আমি বুঝি না আমরা কিসের জন্য এতোগুলো লোক এখানে প্রাণ দেবো?'

যুদ্ধযাত্রা থেকে পিঠটান দিল মুনাফিক দলপতি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। একা নয়, সাথে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তার গোত্রের অন্যান্য মুনাফিক ও সংশয়বাদীকেও।

তারা সংখ্যায় ছিলো মুসলিম সৈন্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এই বিপুল সৈন্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে রাসূল (সা)-এর দল থেকে।

তবুও ভেঙ্গে পড়লেন না সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা)।

বাকি সৈন্য নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন দুর্বার গতিতে।

সামনেই উহুদ।

উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী প্রান্তে মোতায়েন করলেন রাসূল (সা) তাঁর প্রিয় সাথীদের।

www.pathagar.com

দাঁড়ালেন পাহাড়কে পেছনে রেখে এবং ভেসে এলো সেনাপতির নির্দেশ, 'আমি যুদ্ধের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না।'

তিন

বেপরোয়া এবং উদভ্রান্ত কুরাইশ বাহিনী।

চক্রান্তের অপছায়া তাদের চোখে মুখে।

তাদের উট এবং ঘোড়াগুলোকে তারা ছেড়ে দিল মুসলমানদের পলি বিধৌত ছামগার ফসল সমৃদ্ধ ভূমিতে। অবোধ পশুরা খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে মুসলমানদের স্বপ্নের ফসল।

অদূরে মুসলিম বাহিনী।

তাঁরা দেখছেন অবাক বিস্ময়ে।

দেখছেন আর ভাবছেন।

কুরাইশদের জঘন্যতম দস্যুপনা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে!

এগিয়ে এলেন একজন আনসার রাসূল (সা)-এর কাছে। চোখে তাঁর ক্রোধের বারুদ। চিৎকার করে বললেন, 'অসহ্য! অসহ্য কুরাইশদের এই হীন তৎপরতা! এর জবাব একমাত্র তরবারি!'

রাসূল (সা) সম্মত হলেন।

মুহূর্তে গর্জে উঠলেন মুসলিম সৈন্যরা। সেনাপতির নির্দেশে।

সংখ্যায় তাঁরা মাত্র সাতশো।

প্রতিপক্ষও প্রস্তুত। সংখ্যায় তারা তিন হাজার।

এবারও বদরের মতো অসম যুদ্ধ।

সংখ্যার দিক দিয়ে কুরাইশরা অনেক বেশি।

আবু সুফিয়ান কুরাইশদের সেনাপতি।

রাসূল (সা)-ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।

দু'টো বর্ম পরে নিলেন সেনাপতি রাসূল (সা) এবং যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে।

পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনীও নিযুক্ত করলেন তিনি। সৈন্যদের আক্রমণ থেকে পশ্চাৎভাগ রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের সুরঙ্গ পথে তাঁদের নিয়োজিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে করলেন এই

www.pathagar.com

বিশেষ বাহিনীর সেনাপতি। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, 'যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি আর পরাজিত হই, কোনো অবস্থাতেই শত্রুকে পেছন দিক থেকে আসতে দেবে না। দৃঢ়ভাবে নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার দিক থেকে যেন আমরা আক্রান্ত না হই।'

রাসূল (সা) তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করলেন। সূর্যের সোনালী কিরণে চকচক করে উঠলো ধাতব অসি। ঝিলিক দিয়ে উঠলো তরবারির সুতীক্ষ্ণ ধার।

রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন, 'কে আছো এমন সাহসী যোদ্ধা! যে এই তরবারির হক আদায় করতে পারো? এগিয়ে এসো!'

অনেকেই এগিয়ে এলেন।

কিন্তু তরবারিটি তাদেরকে দিলেন না রাসূল (সা)।

এবার সাহসী ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন দুঃসাহসী আবু দুজানা। জিজ্ঞেস করলেন, 'হে রাসূল (সা), এই তরবারির হকটা কি?'

রাসূল (সা) বললেন, 'এই তরবারি দিয়ে শত্রুকে এতো বেশি আঘাত করতে হবে যেন তা বাঁকা হয়ে যায়।'

আবু দুজানা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমি এই তরবারির হক আদায় করবো। হে রাসূল (সা), তরবারিটি আমাকে দিন।'

আবু দুজানার জবাবে খুশি হলেন সেনাপতি মুহাম্মাদ (সা)। তরবারিটি তিনি হযরত আবু দুজানাকেই দিলেন।

চার

যুদ্ধ শুরু হলো পরদিন।

তুমুল যুদ্ধ!

যুদ্ধের তাণ্ডবে ভারী হয়ে উঠলো উহুদের উত্তপ্ত বাতাস।

পাখিরা কম্পমান।

পাহাড়গুলো টালমাটাল।

যুদ্ধ চলছে!

উহুদের যুদ্ধ!

আবু দুজানা রাসূল (সা)-কে দেয়া অঙ্গীকার পূরণে তৎপর। তরবারির হক আদায় করে চলছেন তিনি। প্রতিপক্ষরা দাঁড়াতে পারে না আবু দুজানার তরবারির সামনে।

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষের যাকে পান, তাকেই হত্যা করেন তিনি। এক সময় তাঁর তরবারির সামনে পড়লো পাপিষ্ঠা হিন্দা। নড়ে উঠলো আবু দুজানার তরবারি। কিন্তু না, রাসূল (সা)-এর তরবারি দিয়ে তিনি একজন নারীকে হত্যা করা ঠিক মনে করলেন না। ভাবলেন, তাতে অপমান করা হবে এই তরবারির।

আবু দুজানা ছেড়ে দিলেন হিন্দাকে।

ওদিকে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন দুঃসাহসী হামযা (রা)।

তিনি হত্যা করে চলেছেন প্রতিপক্ষ শত্রুকে। হত্যা করলেন কাফেরদের পতাকাবাহী– আর তাই ইবনে আবদ শুরাহবীলকে।

ক্রমাগত যুদ্ধ করে যাচ্ছেন অসীম সাহসী হামযা।

যুদ্ধ করতে করতে ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর সমগ্র শরীর।

রক্তাক্ত তরবারি। ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন হামযা (রা)।

ক্রমাগত সামনে।

ওঁৎ পেতে বসে ছিলো কুরাইশ গোলাম– ওয়াহশী। শর্ত ছিলো, যদি সে হামযাকে হত্যা করতে পারে তবে তাকে তারা মুক্তি দেবে।

সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো ওয়াহশী।

যখন সুযোগ পেল, তখন মুহূর্তমাত্র দেরি না করে হামযাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলো ওয়াহশী।

বর্শাটি বিধে গেল হামযার তলপেটে।

তবুও তিনি চেষ্টা করলেন উঠতে।

কিন্তু পারলেন না।

একটু পরেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো এক মহান সৈনিক– হামযার দেহ।

শহীদ হলেন তিনি!

মু'সআব ইবনে উমাইর (রা)। রাসূল (সা)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শহীদ হলেন।

মু'সআব ইবনে উমাইর (রা) শহীদ হলে পতাকা তুলে দিলেন রাসূল (সা) শেরে খোদা আলী (রা)-র হাতে।

পতাকা হাতে নিয়ে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুঃসাহসী আলী (রা) যুদ্ধের ময়দানে।

উহুদের যুদ্ধ আরো ভয়ংকর আকার ধারণ করলে হযরত আলী (রা) চিৎকার করে বললেন, 'কে আছো, এসো! আমি বিভীষিকার পিতা!'

www.pathagar.com

এভাবে জ্বলে উঠলেন সাহসের আগ্নেয়গিরি– হযরত আলী (রা)।

আলীর হুংকার শুনে এগিয়ে এলো কুরাইশদের একযোদ্ধা– আবু সাদ। যে বলেছিল, 'আমি বিভীষিকা সৃষ্টিকারী।'

শক্তিশালী যোদ্ধা হযরত আলী (রা)। তিনি মুহূর্তেই হত্যা করলেন 'বিভীষিকা সৃষ্টিকারী' আবু সাদকে।

আসিম ইবনে আবুল আকলাহ্ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে হত্যা করলেন মুসাকে এবং তার ভাই জুলাস ইবনে তালহাকে।

তাদের মা হত্যাকারীর নাম জানার পর বললো, 'আসিম ইবনে আকলাহ্কে যদি কেউ হত্যা করতে পারে, তবে আমি তার মাথার খুলিতে মদ পান করবো।'

মুসলিম বাহিনীর আর এক দুঃসাহসী যোদ্ধা হযরত হানজালা। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হলেন। তাঁর জন্যে গোসল ছিলো অপরিহার্য। ফেরেশতারা তাকে গোসল দিলেন পরম শ্রদ্ধায়।

মুসলিম বাহিনী হামযাসহ বেশ কয়েকজন বড়ো বড়ো যোদ্ধা শহীদ হলেন উহুদের ময়দানে।

কিন্তু তার বিনিময়ে তাঁরা উপস্থিত হলেন কাঙ্খিত বিজয়ের কাছাকাছি।

প্রতিপক্ষের বহু যোদ্ধা নিহত হলো। চরমভাবে পরাভূত হলো আবু সুফিয়ানের বাহিনী।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র।

তারপর!

তারপরই উহুদের প্রান্তরে ঘটে গেল অন্য এক করুণ দৃশ্য!

পাঁচ

যুদ্ধের বিজয়টা যখন মুসলমানদের হাতের মুঠোয় তখনই নেমে এলো এক অনাকাঙ্খিত বিপর্যয়।

কুরাইশরা প্রাণভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাচ্ছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে।

তীরন্দাজ বাহিনী তা দেখে বেখেয়াল হয়ে ধাওয়া করলেন পলায়নরত কুরাইশদের পেছনে।

www.pathagar.com

তাদের পেছনের গিরিপথটি রয়ে গেল সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

সেনাপতি রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলিম বাহিনী নতুন করে আক্রান্ত হলেন পেছন দিক থেকে।

প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে যে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হলো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সুযোগ পেয়ে তারা আবার সংঘবদ্ধ হলো।

জোর হামলা চালালো তারা বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের ওপর।

এই বিচ্ছিন্নতার কারণে শহীদ হলেন বেশ কিছু মুসলিম সৈনিক।

অকস্মাৎ ভেসে এলো এক প্রলয়ংকরী শব্দ- 'মুহাম্মাদ (সা) নিহত হয়েছেন!'....

শব্দটি শোনার সাথে সাথে বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈনিকরা পুনরায় একত্রিত হলেন।

ক্রমশ উহুদ হয়ে উঠলো মুসলমানদের জন্যে এক কঠিন পরীক্ষার প্রান্তর।

ভয়াবহ ময়দান।

মুসলিম সৈনিকরা প্রাণপণে যুদ্ধ করেও আর পরাভূত করতে পারছেন না কাফেরদের।

একটু একটু করে কাফেররা অগ্রসর হচ্ছে।

অগ্রসর হতে হতে এক সময় তারা প্রায় পৌঁছে গেল রাসূল (সা)-এর কাছাকাছি। তাদের হাত থেকে ছুঁড়ে মারা পাথরের আঘাতে শহীদ হলে রাসূল (সা)-এর একটি মুবারক দাঁত!

রক্তাক্ত হয়ে গেল তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল!

কপাল জখম হয়ে ফিনকি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল রাসূল (সা)-এর পবিত্র রক্ত।

ইবনে কুময়া আঘাত করলো রাসূল (সা)-এর চোয়ালের উপরিভাগে। মুহূর্তে তাঁর শিরোস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে ঢুকে গেল রাসূল (সা)-এর চোয়ালের ভেতর।

রক্তে রঞ্জিত রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল!

রাসূল (সা)-এর শরীরের রক্ত প্রবাহকে সইতে পারলেন না মালিক ইবনে সিনান (রা)।

www.pathagar.com

তিনি চুষে নিলেন প্রিয় নবী (সা)-এর মুখের পবিত্র খুন।

কাফের বাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো রাসূল (সা)-কে।

রাসূল (সা) বললেন, 'এমন কে আছো, যে আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারবে? জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত আছো কে ? এগিয়ে এসো!'

সেনপতির নির্দেশে উঠে দাঁড়ালেন যিয়াদ ইবনে সিকানসহ পাঁচজন দুঃসাহসী আনসার। বললেন, 'আমরা প্রস্তুত আছি। প্রস্তুত আছি জীবন কুরবানী দিতে হে রাসূল!'

তারা এগিয়ে এলেন প্রতিরক্ষার জন্যে। এবং একে একে তারা প্রত্যেকেই শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জুড়াতে থাকলেন তাদের হৃদয়ের অদম্য পিপাসা।

এবার এগিয়ে এলেন অসীম সাহসী বীর আবু দুজানা। নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে তিনি রক্ষা করতে থাকলেন রাসূল (সা)-কে। একের পর এক কাফেরদের তীর এসে বিধে যাচ্ছিল আবু দুজানার পিঠের ওপর। আর তিনি অকাতরে রাসূল (সা)-কে আড়াল করে, ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন পর্বতের মতো।

নবী (সা)-কে রক্ষার জন্যে আবু দুজানার পিঠে অসংখ্য তীরের ফলা বিধে গেল।

www.pathagar.com

তবু তিনি কাফেরদের নিক্ষিপ্ত একটি তীরও বিদ্ধ হতে দিলেন না রাসূল (সা)-এর পবিত্র শরীরে।

ছয়

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন রাসূল (সা)। দেখলেন, চারপাশ ঘিরে আছেন নক্ষত্রেরা– আবুবকর, উমর, আলীসহ অনেকেই। বিধ্বস্ত তাদের চেহারা। কিন্তু চোখে মুখে সাহস এবং প্রত্যয়ের বিদ্যুৎ।

পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে রাসূল (সা) স্বয়ং বেরুলেন হামযার খোঁজে।

হামযা (রা)-র বিকৃত দেহকে পেলেন তিনি প্রান্তরের মাঝখানে। দেখলেন, হামযা (রা)-র পেট চিরে কলিজা বের করা হয়েছে। তার নাক, কান কেটে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে।

হামযার এই বীভৎস দৃশ্য দেখে কেঁদে উঠলো রাসূল (সা)-এর কোমল হৃদয়।

হামযা (রা) শুধু একজন দুঃসাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর চাচা।

সেই প্রাণাধিক চাচার ওপর কাফেরদের কাপুরুষচিত পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখে শিউরে উঠলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

হযরত হামযাসহ মুসলিম বাহিনীর শহীদদের লাশ বিকৃত করেছিলেন হিন্দা এবং তার সাথীরা।

হিন্দা নিজে হামযার কলিজা টেনে বের করে তা চিবালো কিন্তু গিলতে পারলো না।

এই মহিলাই সেদিন শহীদদের নাক, কান কেটে তা দিয়ে গলার মালা এবং কানের দুল বানিয়েছিল।

সাত

উহুদ যুদ্ধ!

উহুদ যুদ্ধ ছিলো এক ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার যুদ্ধ!

উহুদ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ-মুমিন এবং মুনাফিকের মাঝখানে একটি সনাক্তযোগ্য দেয়াল তুলে দিলেন। যারা মুখে ঈমানের দাবি করতো

www.pathagar.com

এবং মনে প্রাণে সুবিধাবাদী ছিল, যারা গোপনে গোপনে কুফরীকে সমর্থন করতো– উহুদ যুদ্ধের মাধ্যমে তারা সবাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।

আর আল্লাহ্ পাক যাঁদেরকে শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন, এই দিনে তারা শাহাদাতের মর্যাদায় হলেন অভিষিক্ত।

উহুদ যুদ্ধ!

হক এবং বাতিলের যুদ্ধ। মুসলমান আর কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ।

উহুদ যুদ্ধ!

ঈমানের চূড়ান্ত এক অগ্নিপরীক্ষার যুদ্ধ।

আট

নবী মুহাম্মাদ (সা)!

মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের বিপরীতে এক দুঃসাহসী পর্বত।

ছিলেন আশ্চর্য এক রণকুশলী।

যার রণকৌশলের কারণে, নেতৃত্বের নিপুণতায় উহুদের প্রান্তরে সুসজ্জিত বিশাল কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যরা পৌঁছুতে পেরেছিলেন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।

নবী মুহাম্মাদ (সা)!

অবাক সেনাপতি!◎

www.pathagar.com

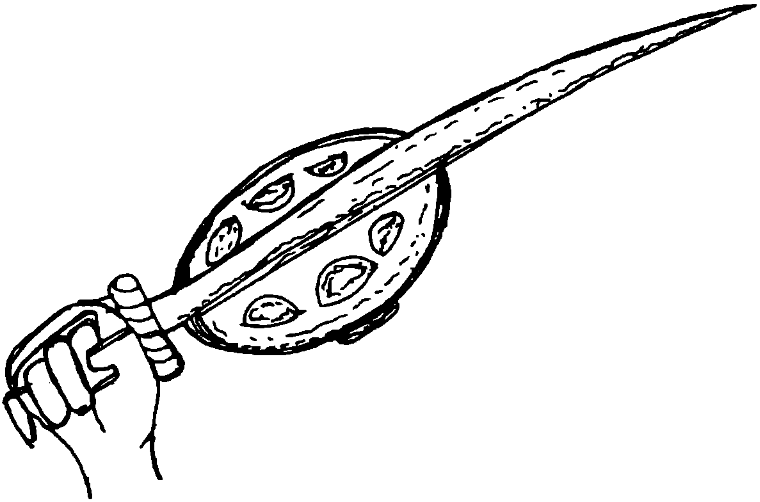

পরীক্ষার আগুন

বদর যুদ্ধ!

ভয়ানক এক যুদ্ধ!

মুসলিম মুজাহিদরা প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছেন। কাফেরদের সাথে।

এরই ভেতর একজন মুজাহিদ ছুটছেন। মুশরিকদের ব্যূহ ভেদ করে।

তাঁর তরবারির ধার দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

আর ভীত সন্ত্রস্ত মুশরিকরা।

তাঁর তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে তারা পালাচ্ছে দিকবিদিক। দিশেহারা তারা। শত্রুদের একজন ঘুরে ফিরে বারবার তার কাছে আসছিল।

তিনি এক সময় তার গর্দানটি তরবারির আঘাতে আলাদা করে দিলেন।

এই নিহত লোকটি ছিল হত্যাকারীর পিতা।

অসম্ভব দুঃসাহসী এক মুজাহিদ!

লড়ে যাচ্ছেন বদর প্রান্তরে।

www.pathagar.com

মৃত্যুর ভয় নেই।

জীবনের পিছুটান নেই।

ক্রমাগত সামনে এগুচ্ছেন। ছুটছেন বিদ্যুৎ গতিতে।

কে তিনি?

এই অমিত তেজী মুজাহিদের নাম—আবু উবাইদা (রা)।

আর তার পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।

পুত্রের হাতে পিতৃহত্যার ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

তবুও আবু উবাইদা (রা) তা করেছিলেন। কেননা, এটা ছিল সত্য আর মিথ্যার যুদ্ধ।

এটা ছিল ইসলাম আর কুফরের মধ্যে যুদ্ধ।

হযরত আবু উবাইদা (রা)!

স্বয়ং রাসূল (সা) তার সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা (রা)।'

আর তার সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন, 'কুরাইশদের মধ্যে তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা আমাকে কোনো কথা বললে মিথ্যা বলবেন না। আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন, হযরত আবু বকর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আবু উবাইদা (রা)।

আবু উবাইদা (রা) হত্যা করেছিলেন তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহকে। বদরের যুদ্ধে। প্রকৃত পক্ষে তিনি পিতাকে হত্যা করেননি। হত্যা করেছিলেন শিরক বা পৌত্তলিকতাকে।

এই ঘটনার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবু উবাইদা (রা) ও তার পিতার শানে নাজিল করে নিচের আয়াতটি–

তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে– তারা তাদের পিতাই হোক কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন

www.pathagar.com

এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখো, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। [আল মুজাদিলা ২২]

বদর যুদ্ধের আগের কথা।

কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসূল (সা) একদল সাহাবীকে পাঠান। এই দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পান আবু উবাইদা (রা)।

খাদ্য হিসেবে তাদের কাছে ছিল সামান্য কিছু খোরমা।

আবু উবাইদা (রা) তাই নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন।

দিন শুরু হলে তিনি সাথীদের হাতে একটি করে শুকনো খোরমা তুলে দিতেন। আর সাথীরা খুশি মনে সেই খোরমাটি মুখে দিয়ে সারাদিন চুষতেন। ঐ একটি মাত্র খোরমাই ছিল তাঁদের জন্য সারাদিনের খাদ্য। এত কষ্ট তাঁরা করেছেন। আবু উবাইদা (রা)-র নির্দেশে।

কিন্তু তাঁদের মনে কোনো দুঃখ ছিল না।

ছিল না কষ্টের কোনো লেশমাত্র।

থাকবে কেন?

তাঁরা তো সবাই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহর রাস্তায়।

আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূল (সা)-কে খুশি করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উহুদের যুদ্ধ!

সেটা ছিল ভীষণ এক যুদ্ধ!

যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হলেন। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এ সময়ে মুশরিকরা জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো—

কোথায় মুহাম্মাদ?

মুহাম্মাদ (সা) তখন ছিলেন দশজন সাহাবা বেষ্টিত।

যারা মুশরিকদের তীরের সামনে বুক পেতে দিয়ে প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)-কে হেফাজত করছিলেন।

এই দশজন সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু উবাইদা (রা)।

www.pathagar.com

উহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা)-এর দাঁত শহীদ হয়েছে।

রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তাঁর চেহারা মুবারক দিয়ে।

গণ্ডদেশে তখনও বিধে আছে বর্মের দুটো বেড়ি।

আবু উবাইদা (রা) এগিয়ে গেলেন রাসূল (সা)-এর দিকে।

দাঁত দিয়ে উপড়ে ফেললেন একটি বেড়ি। কিন্তু বেড়ি উঠাতে গিয়ে ভেঙ্গে গেল আবু উবাইদা (রা)-র একটি দাঁত।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি বললেন, 'আবু উবাইদা (রা) সর্বোত্তম দাঁত ভাঙ্গা ব্যক্তি।'

রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় প্রতিটি যুদ্ধেই আবু উবাইদা (রা) অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন জীবন বাজি রেখে। সাহসের সাথে।

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর।

হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে আবু উবাইদা (রা)-র নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে নেন।

এই সময় সিরিয়ায় দেখা দেয় প্লেগ।

ভীষণ কঠিন এক রোগ।

www.pathagar.com

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ প্লেগে আক্রান্ত হচ্ছে। মারা যাচ্ছে তারা কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করে।

আবু উবাইদা (রা) তার বাহিনী নিয়ে সেখানেই অবস্থান করেছেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন হযরত উমর (রা)।

তিনি দ্রুত নির্দেশ দিলেন, সাথীদের নিয়ে উবাইদা (রা)-কে মদীনায় ফিরে আসার জন্য।

কিন্তু তকদীরের প্রতি অবিচল আস্থা ছিল হযরত উবাইদা (রা)-র।

খলিফার নির্দেশ পাবার পর তিনি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি আল্লাহর তকদীর থেকে পলায়ন নয়?

খলিফা দুঃখ করে বললেন, 'আফসোস! আপনি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো!'

হ্যাঁ! আল্লাহর তকদীর থেকে পালাচ্ছি। তবে অন্য তকদীরের দিকে।

আবু উবাইদা (রা) ছিলেন দৃঢ় মনের মানুষ। তিনি তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় থেকে গেলেন। সেই মহামারী প্লেগের মধ্যে।

হযরত উমর (রা) ফিরে এলেন মদীনায়।

ভীষণ চিন্তিত তিনি।

ভাবছেন, কীভাবে ফেরানো যায় তাকে!

অবশেষে তিনি একটি চিঠি পাঠালেন আবু উবাইদাকে। লিখলেন, 'আপনাকে আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব করছি। আমার এই পত্রখানা যদি রাতের বেলা আপনার কাছে পৌছে তাহলে সকাল হবার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।'

খলিফা উমরের চিঠি পেয়ে একটু মুচকি হাসলেন আবু উবাইদা। বললেন, 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান।'

তার পর তিনি হযরত উমরকে একটি চিঠি লেখেন—

আমিরুল মুমিনীন!

আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝেছি আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি তাদের ওপর যে মুসিবত আপতিত হয়েছে তা থেকে

www.pathagar.com

আমি নিজেকে বাঁচাবার প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না, যতোক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আমার এই পত্রখানা আপনার হাতে পৌছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দান করুন।

উবাইদা (রা)-র চিঠি পেয়ে হযরত উমর (রা)-এর দু'চোখে ভিজে গেল।

পাশের সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমিরুল মুমিনীন! আবু উবাইদা (রা) কি ইন্তিকাল করেছেন ?'

উমর (রা) জবাবে বললেন, 'না। তবে তিনি এখন মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে।'

সত্যিই, এর পর পরই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করলেন অসীম সাহসী সৈনিক— হযরত আবু উবাইদা (রা)।

হযরত আবু উবাইদা (রা)!

খোদাভীতি, তাকওয়া, সাহস, বিনয়, স্নেহ, দয়া-মায়া ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জীবন যাপনে ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। এতই সাধারণ আর বিনয়ী ছিলেন, সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে আদৌ পৃথক করা যেত না।

আর প্রাণে ছিল তার গভীর ভালোবাসা।

ভালোবাসা ছিল আল্লাহর প্রতি।

রাসূল (সা)-এর প্রতি এবং ইসলামের প্রতি।

কী অসামান্য এক আলোকিত পুরুষ ছিলেন হযরত আবু উবাইদা (রা)!◎

www.pathagar.com

দুঃসাহসী স্বর্ণঈগল

আল বারা ইবনে মালিক (রা)।

অসীম সাহসী এক যোদ্ধা।

রাসূল (সা)-এর সাথে বহু যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি তার সাহস আর রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন।

রাসূল (সা)-কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন বারা।

ইসলাম এবং আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁর শর্তহীন দরদ আর অনন্ত ভালোবাসা।

রাসূল (সা)-ও তাঁকে ভালোবাসতেন অনেক বেশি। সেই ভালোবাসা ছিল পূর্ণিমার জোছনার চেয়েও কোমল।

গোলাপের চেয়ে সুরভিত।

আর মধুর চেয়েও মিষ্টি।

রাসূল (সা)-এর এই ভালোবাসার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে সবসময় মনে রাখতেন হযরত বারা (রা)।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর খলিফার দায়িত্ব পালন করছেন হযরত আবু বকর (রা)।

ইসলামের প্রথম খলিফা।

এ সময়ে গোটা আরব ভূখণ্ডে দেখা দিল ভণ্ড নবী ও যাকাত অস্বীকার কারীদের উৎপাত।

কী আশ্চর্য!

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পরপরই রাতারাতি এসব ভণ্ডেরা নবীর দাবিদার সেজে বসলো।

তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছিল। তাদেরকে ফেলে দিচ্ছিল সন্দেহের দোলায়।

কী সর্বনাশা কাণ্ড!

খলিফা আবু বকর (রা)-এর কাছে এসব ভণ্ড নবীদের খবর আসে। শোনেন তিনি এদের সম্পর্কে নানা কথা। শোনেন আর ভাবেন, 'কী করা যায়! কী ব্যবস্থা নেয়া যায় এদের বিরুদ্ধে! নিশ্চয় যুদ্ধ ছাড়া এদেরকে নির্মূল করার আর কোনো পথ নেই। যুদ্ধই একমাত্র ফায়সালা। যুদ্ধই অনিবার্য।'

ভণ্ড নবীদের একজন ছিল মুসায়লামা আল-কাজ্জাব। কাজ্জাব অর্থ– মিথ্যাবাদী।

এই মিথ্যাবাদী মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খলিফার নির্দেশে তৈরি হলেন মুসলিম বাহিনী।

ইয়ামামার প্রান্তর।

মুসলিম বাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য পৌঁছে গেলেন ইয়ামামার রণক্ষেত্রে।

মুহূর্তেই বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা।

মুসায়লামার সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ।

মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ।

খালিদ (রা)-এর বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন আর এক টগবগে সাহসী যোদ্ধা। নাম– বারা ইবনে মালিক (রা)।

যুদ্ধ চলছে প্রচণ্ড গতিতে।

www.pathagar.com

যুদ্ধের মধ্যেই এক সময় বারা (রা) সেনাপতি খালিদ (রা)-কে বললেন, 'হে সেনাপতি! আপনি উঠে আদেশ করুন।'

তারপর বারা (রা) নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মদীনার অধিবাসীগণ! আজ তোমরা অন্তর থেকে মদীনার চিন্তা মুছে ফেল। আজ তোমাদের অন্তরে শুধু আল্লাহ এবং জান্নাতের স্মরণ থাকাটাই উচিত।'

বারা (রা)-র এমন অগ্নিময় ভাষণ শুনে নতুন করে জ্বলে উঠলেন মুসলিম সৈনিকরা।

তারা মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুসায়লামার বাহিনীর ওপর।

তুমুল যুদ্ধ!

হযরত বারা (রা)-ও নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলেন।

মুসায়লামার এক শক্তিশালী যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করার পর বারা তার দেহটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন।

মুসলিম বাহিনী মুসায়লামার বাহিনীকে পদদলিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যান।

পেছনে ছিল একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাগান। মুসায়লামা লুকিয়ে ছিল সেই বাগানের মধ্যে। প্রাণের ভয়ে তার বাহিনী পিছু হঠতে হঠতে সেই বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত গেছে।

মুসায়লামার বাহিনী দ্রুত বাগানে ঢুকে বাগানের মূল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

দুঃসাহসী বারা (রা)।

তিনি মুসায়লামার বাহিনীকে শিয়াল তাড়া করে নিয়ে গেছেন সেখানে। তারা প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করলে বারা দাঁড়িয়ে যান ফটকের সামনে। তারপর সিংহের মত হুংকার ছেড়ে তার সাথীদেরকে বললেন, 'আমি বারা ইবনে মালিক (রা)! তোমরা আমার সাথে এসো।'

সহযোদ্ধারা এগিয়ে এলে তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা আমাকে উঁচু করে ছুঁড়ে মার প্রাচীরের মধ্যে।'

প্রথমে তো তার সাথীরা কেউ রাজিই হননি কিন্তু বারা (রা)-এর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। তারা উঁচু করে তুলে ধরলেন বারা (রা)-কে

www.pathagar.com

বারা (রা)!

দুঃসাহসী বারা (রা) একবার তাকিয়ে দেখলেন ফটকের ভিতর। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের মধ্যে। একাই।

ফটকের মুখেই প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো বারা (রা)-র।

মুসায়লামার বাহিনীকে বারা একাই ছিন্নভিন্ন করে দেন। যুদ্ধের মধ্যেই তিনি প্রাচীরের মূল দরোজাটা খুলে দেন। আর সাথে সাথে দুর্ধর্ষ বানের মত প্রবেশ করেন সেখানে মুসলিম বাহিনী।

আবারও শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ।

যুদ্ধে ভণ্ডনবী মুসায়লামা নিহত হলো। আর চরমভাবে পরাজিত হলো তার বাহিনী।

ইয়ামামার প্রান্তরে মুসায়লামার বাহিনীর প্রতিপক্ষে হযরত বারা (রা) দেখিয়েছিলেন এক অপরিসীম সাহস।

এই যুদ্ধে তিনি একাই দশজন মিথ্যাবাদী দুশমনকে হত্যা করেছিলেন। আর তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আশিটিরও বেশি তীর বর্শা প্রভৃতির আঘাতের চিহ্ন সূর্যের মত জ্বল জ্বল করছিল।

ইরাকের হীরক যুদ্ধেও হযরত বারা (রা) তার সেই সাহস আর বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। স্বাক্ষর রাখেন তার রণকৌশলের।

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী অবরোধ করে রেখেছেন নগরের একটি দুর্গ।

শত্রু বাহিনীও ছিল দারুন চতুর।

আনাস (রা)-কে নিয়ে শিকল উপরের দিকে উঠছে ক্রমাগত!

অকস্মাৎ এই করুণ দৃশ্যটি চোখে পড়লো হযরত বারা (রা)-এর।

তিনি মুহূর্তেই ছুটে গিয়ে সেই গরম শিকল ধরে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারেন যার কারণে শিকলটি ছিঁড়ে আনাস (রা) নিচে পড়ে গেলেন।

শিকল টানার কারণে বারা (রা)-র হাতের মাংস উঠে গিয়ে চকচকে হাড় বেরিয়ে গেল।

তারা ভিতর থেকে আগুনে পোড়ানো প্রচণ্ড গরম কাঁটাযুক্ত শিকল দুর্গের প্রাচীরের ওপর বিছিয়ে রেখেছে। যাতে করে কোনো মুসলিম সৈনিক প্রাচীরের গা ঘেঁষতেও না পারেন।

হযরত আনাস (রা) সাহস করে এগিয়ে গেলেন প্রাচীরের কাছে।

আর যায় কোথায়?

দুর্গের ভিতর থেকে শত্রুসেনারা সুযোগ বুঝেই কৌশলে আনাস (রা)-কে শিকল জড়িয়ে ওপরের দিকে টেনে তুলতে শুরু করলো।

কিন্তু জীবনে বেঁচে যান হযরত আনাস (রা)।

পারস্যের তুসতারে চলছে ভয়ানক যুদ্ধ!

শত্রুবাহিনী সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে নিরাপদ অবস্থান নিয়েছে।

দুর্গের বাইরে মুসলিম বাহিনী।

শত্রুরা এলোপাতাড়ি হামলা চালিয়ে মুসলিম বাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এ সময়ে তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর আশিটিরও বেশি হামলা চালায়।

এমন অবস্থায় একদিন হযরত আনাস বারার কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি সুর করে একটি কবিতা পড়ছেন।

'কী আশ্চর্য! এমনি দুর্যোগ মুহূর্তে সুর করে কবিতা আবৃত্তি!'

আনাস (রা) একটু অপ্রস্তুত হলেন। তিনি হযরত বারা (রা)-র আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বারা (রা)! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস আল-কুরআন দান করেছেন। সেটাই সুর করে পাঠ করুন!'

www.pathagar.com

হযরত বারা (রা) বুঝতে পারলেন আনাস (রা)-এর মনের কথাটা। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, 'সম্ভবত আপনার ভয় হচ্ছে, না জানি আমি কখন মারা যাই, তাই না! আল্লাহর কাছে আমার কামনা, তিনি যেন এমনটি না করেন। মরলে আমি যুদ্ধের ময়দানেই মরবো। এটাই আমার একান্ত বাসনা।'

আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর বারা (রা) সম্পর্কে এমনি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। দয়ার নবী (সা) তাঁর সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, 'বিক্ষিপ্ত ও ধূলিমলিন কেশবিশিষ্ট এমন অনেক ব্যক্তি, মানুষ হিসেবে যাদের কোনো গুরুত্বই নেই– কিন্তু তারা আল্লাহর নামে কসম খায়, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। আল বারা ইবনে মালিক (রা) তাদের অন্যতম।'

তুসতারে যখন মুসলিম বাহিনী দুর্গের পতন ঘটাতে অক্ষম হয়ে পড়লেন, তখন রাসূল (সা)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা তাঁদের স্মরণ হলো।

আর দেরি না করে তারা চলে গেলেন বারা (রা)-র কাছে। বললেন, 'বারা (রা)! আপনি আল্লাহর নামে একটু কসম খান।'

তাদের কথা শেষ না হতেই হযরত বারা (রা) হাত উঠালেন আল্লাহর দরবারে। বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনার নামে কসম খেয়ে বলছি, আজ আপনি মুসলমানদের একটু বিজয় দান করুন এবং আমাকে রাসূল (সা)-এর দর্শন দান করে সম্মানিত করুন।'

মহান রাব্বুল আলামীন হযরত বারা (রা)-র এই দোয়া কবুল করলেন।

তুসতারের যুদ্ধে হযরত বারা (রা) একাই একশো দুশমনকে হত্যা করেন। এবং তারপর–

তারপর হযরত বারা (রা), এই দুঃসাহসী যোদ্ধা শাহাদাতের পেয়ালা পান করে অর্জন করলেন এক গৌরবজনক সম্মান।

হযরত বারা (রা)! মিথ্যার অসংখ্য দুর্গ ভেদকারী এক দুঃসাহসী স্বর্ণঈগলের নাম– হযরত বারা ইবনে মালিক (রা)।◎

www.pathagar.com

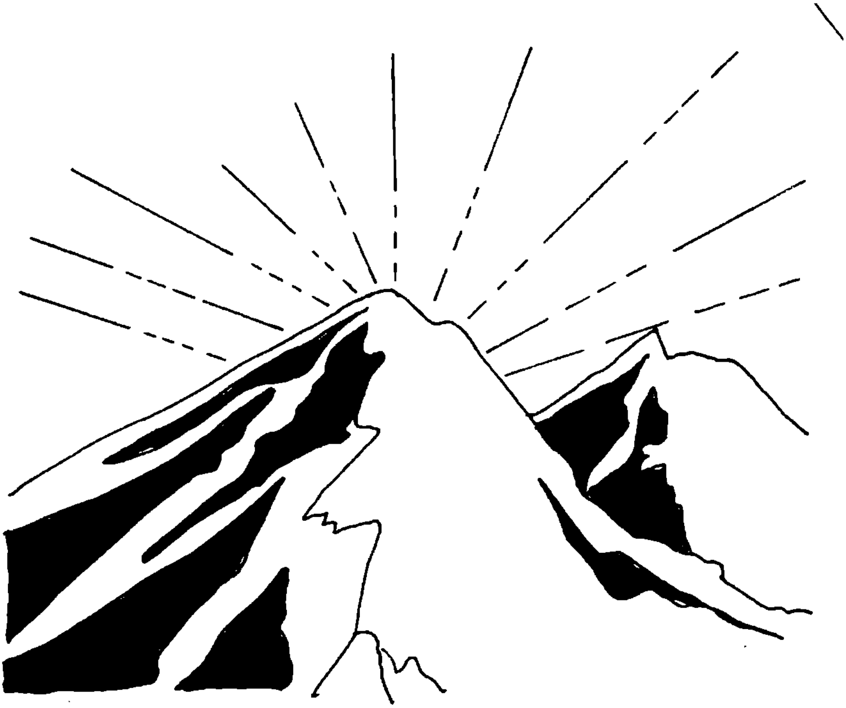

বিরল পুরস্কার

তাবুক যুদ্ধ।

রাসূল (সা)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ অভিযান।

তাবুক যুদ্ধটি যেমন ছিল রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ যুদ্ধ, তেমনি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধটি কষ্টের যুদ্ধ নামেও খ্যাত।

কষ্টের কথা আগে থেকে বিবেচনা করেই রাসূল (সা) সকল মুজাহিদকে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নিতে বললেন। যেন কারোর কোনো কষ্ট না হয়। সমস্যায় পড়তে না হয়।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পেয়ে মুজাহিদদের মধ্যে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। যার যা কিছু আছে, তিনি তাই নিয়েই প্রস্তুত হচ্ছেন যুদ্ধে যাবার।

এই মুজাহিদদের মধ্যে একজন ছিলেন অন্যতম। নাম- কা'ব ইবনে মালিক (রা)।

www.pathagar.com

কা'ব ছিলেন কবি এবং রাসূল (সা)-এর খুব প্রিয় সাহাবী। তাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে।

আর রাসূল (সা)-এর প্রতি কা'বের ভালোবাসা ছিল অথই সমুদ্রের মত। বিশাল। সীমাহীন।

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পেয়ে কা'বও তাবুক যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। যুদ্ধের বাহন হিসেবে প্রস্তুত করলেন দু'টি তাগড়া উট।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী যে হলো!

কা'ব আর তাবুক যুদ্ধে গেলেন না।

একে একে সাথীদের সবাই রওয়ানা দিলেন যুদ্ধের জন্য। আর কা'ব কেবলই ভাবেন, আজ নয় কাল যাব। আজ-কাল করতে করতে কা'বের সময়গুলো চলে গেল দেখতে দেখতে। সময় চলে যায়, কিন্তু তার চোখ থেকে কাটে না কেবল দ্বিধার কুয়াশা।

উহুদের পরে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে প্রতিটি যুদ্ধেই কা'ব ছিলেন অগ্রগামী। এমন দ্বিধার আগুনে তিনি দগ্ধ হননি আর কখনো। এবং শেষ পর্যন্ত দোটানার কারণে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারলেন না তাবুক যুদ্ধে।

এর মধ্যে তিনি খবর শুনলেন, একে একে সবাই চলে গেছেন যুদ্ধে। এমন কি, রাসূল (সা)-ও পৌঁছে গেছেন তাবুকে।

মদীনা ও এর আশ-পাশের প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তিই চলে গেছেন তাবুকে। কেবল গেলেন না কা'ব ইবনে মালিক (রা)।

কী লজ্জার কথা!

কা'ব যখন বের হন মদীনার রাস্তায় তখন একমাত্র শিশু, কিছু বৃদ্ধ এবং কিছু মুনাফেক ছাড়া আর কোনো মানুষই তার চোখে পড়ে না।

কা'ব এসব দেখেন আর ধিক্কার দেন কেবল নিজেকে।

অনুশোচনায় পুড়ে পুড়ে খাক হয় কেবল তাঁর কোমল হৃদয়। বারবার ঘুরে দাঁড়ান নিজেরই সম্মুখে, কেন গেলাম না যুদ্ধে ? কেন ?

লজ্জা আর অনুতাপে ভারাক্রান্ত তিনি।

রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধে গেছেন হাজার হাজার বীর সৈনিক।

সংখ্যায় এত বিপুল যে কে এলো, আর কে এলো না– তার হিসেব রাখাই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর তো কোনো দপ্তরও ছিল না সেখানে। তবুও আল্লাহর প্রিয়নবী (সা)-এর কাছে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই গোপন থাকে না। থাকে না ঝাপসা কিংবা অস্পষ্ট।

পৃথিবীর দ্রুততম এবং নির্ভুল বার্তা– ওহীর মাধ্যমে জেনে যান তিনি সকল খবর!

যুদ্ধের এক অবসরে রাসূল (সা) তাকালেন ডানে এবং বামে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কা'ব আসেনি ?'

জবাব দিলেন একজন, 'হে রাসূল (সা)! যুদ্ধে আসার মত কা'বের এত সময় কোথায় ?'

একটু বাড়িয়েই বললেন তিনি।

সাথে সাথে ভেসে এলো আর একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ। কণ্ঠটি মুয়াজ ইবনে জাবালের। তিনি বললেন, 'ওভাবে না বললেও তো পারতেন! আমরা তো কা'বের মধ্যে তেমন খারাপ কিছু দেখিনি!'

মুয়াজের কথা শুনে রাসূল (সা) চুপ থাকলেন।

এক সময় তাবুক থেকে ফিরে এলেন রাসূল (সা)।

কা'বও জেনে গেছেন রাসূল (সা)-এর ফিরে আসার কথা। একবার ভাবলেন, তিনি চলে যাবেন রাসূল (সা)-এর কাছে। সব কিছু খুলে বলবেন তাঁকে।

আবার ভাবলেন অন্য কথা। সত্যিই যদি তিনি আমাকে ভুল বোঝেন, ক্ষমা না করেন কিংবা ঘৃণা করেন ?

মহাচিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন কা'ব। দুর্ভাবনার কুয়াশা তাঁর সমগ্র চেহারায়। কীভাবে বাঁচা যায় রাসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টি থেকে ?

বারবার জিজ্ঞেস করলেন নিজের কাছে।

পরামর্শ চাইলেন বন্ধুদের কাছে।

আবারো ভাবতে থাকেন আকাশ-পাতাল।

অবশেষে।

অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, আমি অবশ্যই যাব রাসূল (সা)-এর কাছে। যাব এবং সব কিছুই খুলে বলবো তাঁকে। সত্য-মিথ্যা মেশানো নয়, নয় কোনো ছল-চাতুরি। সত্যিই বলবো আমি। তারপর। তারপর যে শাস্তি দেবেন দয়ার নবী, সেই শাস্তি মাথা পেতে নেব আমি।

www.pathagar.com

সত্য বলার সাহসটুকু দুলে উঠলো কা'বের সাহসী হৃদয়ে।

তাবুক যুদ্ধে আরো যাঁরা অংশ নেননি– এমন আশিজনের মত লোক রাসূল (সা)-এর কাছে গেলেন। তাঁরা বললেন তাদের কথা। বললেন যেতে না পারার কথা। তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে ক্ষমা চাইলেন রাসূল (সা)-এর কাছে।

তাঁদের সকল কথা শুনলেন রাসূল (সা)।

তাঁর হৃদয়ে তাদের জন্য নেমে এলো ক্ষমার বৃষ্টি। তিনি আল্লাহ্‌র কাছেও তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করলেন।

এরপর কা'ব এলেন। একাকী। রাসূল (সা)-এর কাছে।

কা'বকে দেখে রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেন, 'এসো কা'ব, বসো।'

কা'বের সমগ্র শরীরে বয়ে গেল এক শিরশির অনুভূতি। তিনি কোনো রকমে জড়সড় হয়ে বসলেন রাসূল (সা)-এর সামনে।

রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কা'ব! যুদ্ধে যাওনি কেন?'

কা'ব বললেন, 'হে রাসূল (সা)! আপনার কাছে কী আর গোপন করবো? দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাহ্ হলে হয়তোবা নানা রকম কথার জাল তৈরি করে তাকে খুশি করতাম। সে শক্তি আমার আছে। আমি তো একজন বাগ্মী ও তর্কবাগিশ। কিন্তু তবু, তবু আমি আপনার কাছে কোনো সত্য গোপন করবো না। সেই সাহসও আমার নেই। সত্য বললে এমনও হতে পারে, আল্লাহ্ পাক আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মিথ্যা বললে এই মুহূর্তে আপনি খুশি হলেও মহান রাব্বুল আলামীন নাখোশ হবেন এবং আপনাকেও নাখোশ করে দেবেন আমার ব্যাপারে। আর সেটি হবে আমার জন্য এক চিরস্থায়ী শাস্তি। কষ্টকর ব্যাপার। না, তা হতে পারে না। বরং আমি সত্যই বলতে চাই। হে দয়ার নবী (সা)! না, যুদ্ধে না যাবার পেছনে আমার তেমন কোনো কারণই ছিল না। আমি ছিলাম সুস্থ, সবল এবং অর্থ-বিত্তের দিক থেকেও সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তবু, তবুও এক রকম আলসেমি করে আমি যুদ্ধে যাইনি। সত্যিই কী দুর্ভাগা আমি!'

গভীর মনোযোগের সাথে রাসূল (সা) শুনলেন কা'বের কথা। তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি সত্য বলেছো কা'ব। তুমি এখন যাও। দেখা যাক আল্লাহ্ পাক তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দান করেন।"

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর দরবার থেকে চলে এলেন কা'ব। মনটা ভারাক্রান্ত। তবুও সত্য বলার কারণে তার পাঁজর ভেদ করে মাঝে মাঝেই প্রবেশ করছে এক অপার্থিব শীতল বাতাস।

সত্য বলার কারণে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে তিরস্কারও করলো। এমন বোকামী করলে কেন ? কিছু ওজর-আপত্তি দেখালে তো তুমি রাসূল (সা)-এর ক্ষমা পেয়ে যেতে। এমন আত্মঘাতী সত্য তুমি বলতে গেলে কেন!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কা'ব ছিলেন সত্যের ওপর সুদৃঢ়। না, তিনি টলেননি এতটুকু।

যুদ্ধে না যাবার কারণে রাসূল (সা) কা'বের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন অন্যদের।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ পশ্চাশ দিন যাবত এই নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকে।

কী কষ্টকর ব্যাপার!

কা'ব রাস্তায় বের হন।

সবাই তাঁকে আড়চোখে দেখেন। কিন্তু কেউ কথা বলেন না তার সাথে।

নামাজ পড়তে যান মসজিদে।

যান হাটে-বাজারে।

কিন্তু না, কেউ ভুলেও কথা বলেন না তাঁর সাথে।

রাসূল (সা) বসে আছেন জায়নামাজে। কা'ব সালাম দিলেন। রাসূল (সা) জবাব দিলেন, কিন্তু মনে মনে।

রাসূল (সা)-এর দিকে তাকালে তিনি কা'বের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।

শুধু রাসূল (সা) কেন!

কা'বের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন তাঁর পরিবারের আপনজনেরাও।

যখন কা'বের চলছে এমন দুঃসময়, ঠিক তখনই একজন গাস্সানীয় রাজার একটি চিঠি নিয়ে হাজির হলো তাঁর কাছে। চিঠিটা মেলে ধরলেন কা'ব চোখের আলোয়। তাতে লেখা ছিল, 'তোমার বন্ধু রাসূল (সা) তোমার

www.pathagar.com

প্রতি খুব অবিচার করেছেন। তুমি তো কোনো সাধারণ ঘরের সন্তান নও! তুমি আমার কাছে চলে এসো।'

চিঠিটা পড়ে কা'বের চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। বললেন, 'এটাও আমার জন্য একটি পরীক্ষা!'

তিনি রাগে, ক্ষোভে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেললেন গনগনে আগুনের শিখায়।

দুঃসহ যন্ত্রণা, ঘৃণা আর উপেক্ষার মধ্যে কেটে গেল চল্লিশটি দিন।

চল্লিশ দিন পর রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে একজন এসে বললেন, 'রাসূল (সা)-এর নির্দেশ হলো, তোমরা স্ত্রী থেকে তুমি দূরে থাকবে।'

কা'ব জানতে চাইলেন, 'আমার স্ত্রীকে কি তালাক দেব?'

তিনি বললেন, 'না। শুধু পৃথক থাকবে।'

কা'ব তার স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তোমার বাপের বাড়িতে চলে যাও। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তুমি সেখানেই থাকবে।'

সময় গড়িয়ে যায়।

একদিন পূর্ণ হয়ে যায় পঞ্চাশ দিন।

পঞ্চাশ দিনের মাথায়, ফজরের নামাজ আদায় করে কা'ব ছাদে বসে আছেন।

ভাবছেন আপন মনে।

ভাবছেন আমার জন্য এই আকাশ, এই জমিন সব—সবই কেমন সংকীর্ণ হয়ে গেল! এখন তো জীবনটাই একটি মহা ভারী বোঝা হয়ে গেছে!

এসব ভাবছেন কা'ব। এক মনে।

এমন সময় সালা' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো—'কা'ব শোনো! তোমার জন্য সুসংবাদ!'

শব্দটি শুনেই কা'ব বুঝলেন, তাঁর দোয়া ও তওবা কবুল হয়েছে। সাথে সাথেই তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

শুকরিয়া জানালেন মহান রাব্বুল আলামীনকে। আর মাগফিরাত কামনা করলেন তার ভুলের জন্য।

বাতাসের আগে খবরটি ছড়িয়ে পড়লো মদীনার চারদিকে। রাসূল (সা)-এর কাছে ছুটে এলেন কা'ব। রাসূল (সা)-এর দুই হাতে চুমু খেয়ে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর চেহারা দিয়ে তখন খুশির দীপ্তি কেবলই ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। রাসূল (সা) কা'বকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্মের পর থেকে আজকের দিনটির মত এত ভালো দিন তোমার জীবনে আর কখনো আসেনি।'

'হে রাসূল (সা)! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন?'

রাসূল (সা) হেসে বললেন, 'শুধু আমি কেন! আল্লাহও তোমাকে ক্ষমা করেছেন।'

হযরত কা'ব।

কা'ব সেই সম্মানিত সাহাবী, যার সম্পর্কে আল কুরআনের সূরা আত্ তাওবার ১১৭ নং আয়াতটি নাজিল হয়েছিল।

রাসূল (সা) কা'বকে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনালেন।

রাসূল (সা)-এর তিলাওয়াত শেষ হতেই কা'ব (রা) আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি আমার সমস্ত সহায়-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিলাম!'

রাসূল (সা) হেসে বললেন, 'সবটাই নয়। কিছুটা দান করে দাও।'

কা'ব রাসূল (সা)-এর কথা মত তার খাইবারের সম্পত্তি দান করে দেন এবং তারপর তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ আমার সততার জন্যই মুক্তি দিয়েছেন। আমি অঙ্গীকার করছি, বাকি জীবনে আমি কেবল সত্যই বলবো।'

কেবল সত্য বলার কারণে কা'বের জীবনে যে চরম পরীক্ষা নেমে এসেছিল, ইসলামের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

এত বড় পরীক্ষাতেও কা'ব ছিলেন অটল, সুদৃঢ় এবং ঈমানের বলে মহাবলীয়ান।

আবার সত্য বলার কারণেই কা'ব (রা) পেয়ে গেলেন তার সত্য ও সততার মহান—বিরল পুরস্কার।◎

www.pathagar.com

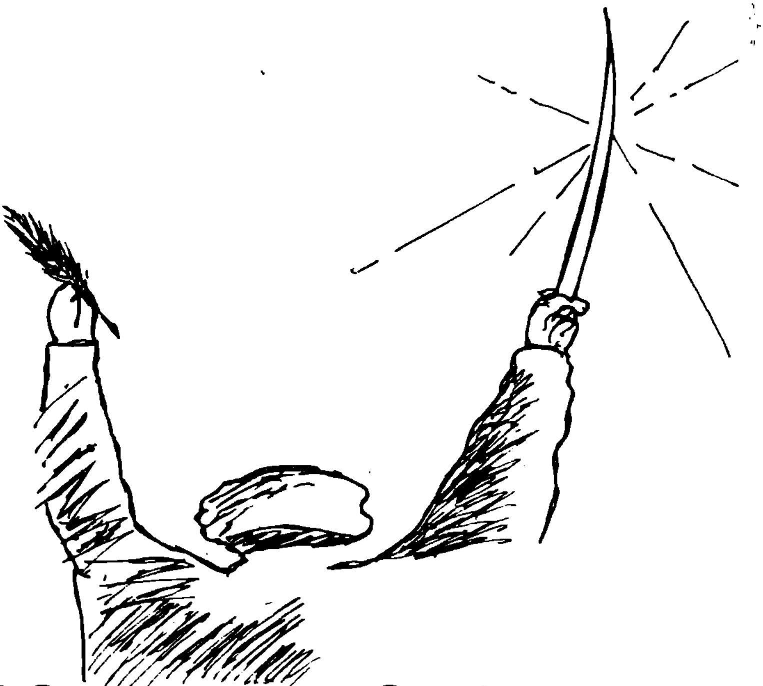

শহীদী কাফেলায় সাহসী কবি

হিজায।

একটি চমৎকার ভূখণ্ড।

হিজাযের অন্যতম একটি নগরী ইয়াসরিব। আর এই নগরীর একটি বিখ্যাত গোত্র— বনু কায়নুকা। এক একটি গোত্রের মধ্যে থাকতো অনেকগুলো উপ-গোত্র। এমনি একটি উপ-গোত্রের নাম খাযরাজ।

এই খাযরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত কবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

তাঁর পুরো নাম— 'আবদুল্লাহ ইবনে হায়লাবা ইবনে ইমরু আল-কায়স ইবনে খাযরাজ ইবনে খাযরাজ আল-আনসারী'। আর মায়ের নাম- কাবাশাহ বিনতু ওয়াকিদ ইবনে ইতানাহ আল খাযরাজী।

খুব বুনিয়াদি বংশের সন্তান ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

www.pathagar.com

সেই জাহেলী যুগেও তার পরিবারটি ছিল সম্মানের দিক থেকে খাযরাজ গোত্রের ভেতর শীর্ষে।

অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার।

জাহেলিয়াতের যুগ।

চারদিক থক থক করছে জমাট অন্ধকার।

তাদের জ্ঞান নেই।

নেই শিক্ষার আলো।

কিন্তু ব্যতিক্রম মাত্র একটি পরিবার। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছিল। সেই অন্ধকার আর অশিক্ষার যুগেও শিক্ষিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

শুধু শিক্ষিত নয়। সেই জাহেলী যুগে বসবাস করেও তার পরিবারটি ছিল একেবারে ভিন্ন। পরিবারের সবাই তখনো এক আল্লাহর ওপর আস্থা রাখতেন। ইবাদত করতেন পরম প্রিয় মহান আল্লাহর।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে কখনো জাহেলিয়াতের আগুন স্পর্শ করতে পারেনি। তিনিও এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। আর শিরক ও কুফরী থেকে সর্বদা নিজেকে মুক্ত রাখতেন।

খুব অল্প বয়স থেকে কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

সেই সময়ে আরো অনেক কবি ছিলেন।

তাদের কবিতায় থাকতো অবিশ্বাস আর অস্যেতর দুর্গন্ধ।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ছিলেন তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি কবিতা লিখতেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তার কবিতায় থাকতো ফুল পাখি নদী মানুষ প্রকৃতি আর এক আল্লাহর অকুণ্ঠ প্রশংসা।

কিন্তু তার হৃদয়ের কোণে কিসের যেন একটা অভাববোধ হাহাকার করে উঠতো।

তখনো তিনি পাননি নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সত্যের সন্ধান।

তখনো তার কাছে পৌছেনি ইসলামের সুমহান দাওয়াত।

নবুওয়াতের একাদশ বছর।

হজ্জের মৌসুম।

আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসছে। ছুটে আসছে তারা পবিত্র মক্কা নগরীতে হজ্জের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

ইয়াসরিব থেকেও এলেন বেশ কিছু মানুষ।

রাসূল (সা) তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিলেন। আহ্বান জানালেন সত্যের দিকে।

রাসূল (সা)-এর দাওয়াত পেয়ে খুশি হলেন তারা। সত্যের সন্ধান পেয়ে আলোকিত হলো তাদের হৃদয় মন। প্রশান্ত হলেন। ফিরে গেলেন ইয়াসরিবে।

ঘরে ফিরে চুপ করে বসে থাকলেন না ইয়াসরিবের এই সাহসী মানুষের। তারা গোত্রের মধ্যে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন প্রিয়নবী (সা)-এর দাওয়াত।

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর।

আবারো হজ্জের মৌসুম।

এবার খাযরাজ গোত্রের বার জন পুরুষ এলেন মক্কা নগরীতে। হজ্জের উদ্দেশ্যে। তারা সমবেত হলেন মিনার উপকণ্ঠে। আকাবা নামক স্থানে।

রাসূল (সা) তাদেরকেও সত্য পথের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত দিলেন ইসলামের।

রাসূল (সা)-এর হাতে হাত রেখে তারা কবুল করে নিলেন ইসলাম।

এটাকেই বলা হয়– 'প্রথম বাইয়াতে আকাবা।'

দেখতে দেখতে কেটে গেল আর একটি বছর। আবার এলো হজ্জের মৌসুম।

হজ্জ পালনের জন্য ইয়াসরিব থেকে এবার এলেন তিয়াত্তর জন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা। তারা সকলেই রাসূল (সা)-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

তিয়াত্তর জনের মধ্যে রাসূল বার জনকে বেছে নিলেন দীনের বিশেষ দাওয়াত দেবার জন্যে।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা) ছিলেন তাদের মধ্যেও অন্যতম।

ইতিহাসে এটাকে দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা বলা হয়।

আর এই বিশেষ বারজনকে বলা হয় 'নকীব'।

ইসলাম গ্রহণের পর সম্পূর্ণ পাল্টে যান কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

www.pathagar.com

আপন হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলেন জাহেলিয়াতের সকল আবর্জনা। নিজেকে সমর্পণ করলেন একমাত্র মহান স্রষ্টার কাছে। আর প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলেন ইসলাম ও প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে।

শুধু তিনি নিজেই বদলে যাননি।

বদলে গেল তাঁর কাব্যচর্চার ধরনও।

এবার তিনি কবিতা লেখা শুরু করলেন ইসলামের পথে। উদ্দীপনামূলক। কবিতা লিখলেন আল্লাহকে নিয়ে।

প্রিয় রাসূল (সা)-কে নিয়ে।

দীনের দাওয়াত নিয়ে।

সেই কবিতায় ঝড় তুললো তাঁর আপন গোত্রের মধ্যে। ঝড় তুললো জাহেল মানুষের মধ্যে। তার কবিতায় কেঁপে উঠলো অন্যসব পথভোলা জাহেল কবিদের বুক।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাসূল (সা)-এর নির্দেশে দীনের পথে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিলেন।

গভীর প্রেমে এক হাতে তুলে নিলেন তরবারি আর অন্য হাতে শাণিত কলম।

এই দুটোর মাধ্যমেই তিনি উচিৎ জবাব দিতে থাকলেন। ইসলামের চরম দুশমনদের।

জাহেলী যুগের কবিরা ইসলাম ও রাসূল (সা)-কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখতো। তাদের সেই কবিতার জবাবও কবিতার মাধ্যমে দিতেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

জাহেলী কবিরা এ ধরনের কবিতা লিখলেই রাসূল (সা) বলতেন, 'হে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)! আমার পক্ষ তাদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দাও।'

রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পেয়ে তিনি শাণিত শব্দ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কবিতার ধারালো অস্ত্রে উচিত জবাব দিয়ে দিতেন।

তাঁর কবিতার বারুদে ঝলসে যেত কাফেরদের পাপিষ্ঠ মুখ।

খুশি হতেন রাসূল (সা)। আনন্দে চকচক করে উঠতো তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখ।

রাসূলও অত্যন্ত ভালোবাসতেন এই সত্যের সৈনিককে।

www.pathagar.com

কবিতা লেখা ছাড়াও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)-র অনেক যোগ্যতা ছিল।

তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। এই প্রতিভা এবং যোগ্যতার কারণে রাসূল (সা) তাঁকে ষোল দিনের জন্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ছিলেন রাসূল (সা)-এর নিত্য সহচর। রাসূল (সা)-এর অনেক সফরে তিনিও সঙ্গী হিসেবে ছিলেন।

সপ্তম হিজরী।

সাথীদের নিয়ে রাসূল (সা) মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। কবিও ছিলেন এই সফরে।

রাসূল (সা) বসে আছেন উটের পিঠে। আর উটের লাগামটি ধরে আছেন রাসূল (সা)-এর প্রিয় কবি আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

উট চলছে উত্তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে। দুলে দুলে। আর সেই তালে তালে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছেন গুনগুন করে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা—

'পথ ছেড়ে দাও বনু নাজ্জামের
আর ছেড়ে দাও রাসূল তরে,
সবার চেয়ে উত্তম যে ধরার পরে।'

এখানে উপস্থিত ছিলেন রাসূল (সা)-এর আর একজন প্রিয় সাহাবী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)। কবির কবিতা শুনে তিনি বললেন, 'হে বনু রাওয়াহা (রা)! তুমি এখন কোথায় অবস্থান করছো তাকি জানো ? একে তো হারাম শরীফ. তার ওপর রাসূল (সা)-এর সম্মুখে। আশ্চর্য! তবুও তুমি কবিতা আবৃত্তি করতে দ্বিধা করছো না?'

রাসূল (সা) শুনলেন উমর (রা)-এর কথা। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'হে উমর! ওকে কবিতা আবৃত্তি করতে দাও। যার হাতে আমার আত্মা, তাঁর শপথ! আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার কথা কাফেরদের কাছে তীক্ষ্ণ তীরের চেয়েও কষ্টদায়ক।'

রাসূল (সা)-এর কথায় একটা প্রশান্ত নীরবতা নেমে এলো কাফেলার ওপর।

আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা)!

কবিতায় তিনি যেমন ছিলেন নির্ভীক, অসীম সাহসী, তেমনি সাহসী ছিলেন সশস্ত্র যুদ্ধেও।

www.pathagar.com

অষ্টম হিজরী।

তখনকার সর্ববৃহৎ রোমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূল (সা) সৈন্য পাঠালেন।

সংখ্যায় মাত্র তিন হাজার।

এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

অপর দিকে রোমানের বিশাল সৈন্যবাহিনী।

তাদের বিপুল সৈন্যবহর দেখে মুসলিম সেনারা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ বললেন, 'চলো, যুদ্ধ না করেই আমরা মদীনায় ফিরে যাই।'

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) পর্বতের মতো অটল থাকলেন। বললেন, 'না! তা হয় না। যুদ্ধ না করে আমরা কাপুরুষের মতো ফিরে যেতে পারি না।'

সমবেত মুসলিম সৈন্যদের লক্ষ্য করে তিনি একটি তেজদীপ্ত ভাষণ দিলেন।

মুহূর্তেই মনোবল ফিরে পেলেন সৈন্যরা এবং বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা।

রোমানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যাবার সময় রাসূল (সা) তিনজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি প্রথম সেনাপতি যায়িদ ইবনে হারিসা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় সেনাপতি জাফর ইবনে আবু তালিব যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবে। আর যদি দ্বিতীয় সেনাপতিও আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তৃতীয় সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব দেবে এবং সেও যদি শহীদ হয় তাহলে সৈন্যবাহিনীর অন্য কেউ সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে।'

রাসূল (সা)-এর এই ঘোষণার সাথে সাথে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন কবি বুঝে গিয়েছিলেন যে তার কাঙ্ক্ষিত শহীদের দরোজা খুলে যাচ্ছে।

ভিতরে ভিতরে তিনি ভীষণ পুলকিত হলেন। শাহাদাতে তামান্নায় চঞ্চল হয়ে উঠলো তাঁর পিপাসিত হৃদয়।

রাসূল (সা) মদীনা থেকে ছল ছল চোখে বিদায় জানালেন কাফেলাকে।

সৈন্যরা রওয়ানা হচ্ছেন মূতার দিকে।

কবির চোখ দুটোও ভিজে গেল। জড়িয়ে গেল কণ্ঠ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাঁদছো কেন?

www.pathagar.com

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কবি বললেন, 'আমি দুনিয়ার কোনো আকর্ষণে কাঁদছি না। পরিবার বা অন্য কারোর প্রতি ভালোবাসা আমার এ কান্নার কারণ নয়। আমি জানি না, আমার প্রত্যাবর্তনের পরে সেখানে আমার কী হবে ? সেই ভয়ে কাঁদছি।'

যুদ্ধ শুরু হলো।

রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যতবাণীও সত্যে প্রমাণিত হলো।

যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন প্রথম সেনাপতি।

এগিয়ে এলেন দ্বিতীয় সেনাপতি।

তিনিও শহীদ হলেন।

এবার যুদ্ধের অগ্রভাগে এগিয়ে এলেন তৃতীয় সেনাপতি– কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শহীদ হলেন।

শহীদ হবার আগেও এই অসীম সাহসী কবি অনেক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

তার সময়ে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি ছিলেন সক্রিয়।

তিনি ছিলেন যুদ্ধ বিদ্যায়ও অত্যন্ত পারদর্শী। পারদর্শী ছিলেন তীর চালনা ও অশ্বারোহণেও।

বিপদ মুসবিতে এতোটুকু কেঁপে উঠতো না তার বুক। চরম মুহূর্তেও অবিচল আস্থা রাখতেন আল্লাহর ওপর। আর তাকওয়ার দিক দিয়ে ছিলেন অসাধারণ।

হযরত আবু দারদা (রা) তার তাকওয়া সম্পর্কে বলেন, 'প্রচণ্ড এক গরমের দিনে আমরা রাসূল (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। সফরটি ছিল খুবই কষ্টদায়ক। ইবনে রাওয়াহা (রা) এবং রাসূল (সা) ছাড়া এই সময়ে আর কেউই রোযা ছিলেন না।'

কবি হিসেবেও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ছিলেন অনেক বড় কবি।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতার মোড় বদলে যায়। জিহাদ এবং শহীদ তার কবিতার একটি বিশাল অংশ দখল করে নেয়। তিনি লেখেন—

'যে আঘাতে ছিন্ন হবে দেহটি মোর
ফুসফুস আমার টুকরো হবে পেয়ে আঘাত
সেই আঘাতই রবের কাছে চাই আমি
তাঁর কাছেতে চাচ্ছি আরো মাগফিরাত।'

www.pathagar.com

তাঁর আর একটি কবিতা এ রকম--

'মৃত্যু থেকে ছাড়া তুমি পাবে নাকো
যেদিনই হোক মৃত্যু তোমায়
করবে ঠিকই ধরাশায়ী,
যুদ্ধ যদি নাইবা করো তাই বলে কি
মৃত্যু থেকে পালিয়ে গিয়ে
হবে তুমি চিরস্থায়ী ?'

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ছিলেন জিহাদী চেতনার কবিতাব লেখার অগ্রসেনানী।

নিজের চরিত্রকে তিনি একমাত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে গড়ে তুলেছিলেন।

এক দুঃসাহসী কবির নাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

তাঁর ভয়ে শত্রুরা থাকতো প্রকম্পিত।

আর তাঁর কবিতা ছিল তরবারির চেয়েও ধারালো।

সেই তিনি– আল্লাহর ভয়ে সব সময়ে থাকতেন কম্পমান। নীরবে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন একান্তে। আল্লাহ প্রেমিক কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)।

রাসূল (সা)-কে তিনি ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। রাসূল (রা)-ও তাঁকে ভালোবাসতেন খুব।

কবির জন্যে রাসূল (সা) কয়েকবার বিশেষভাবে দোয়াও করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের আগে তার একমাত্র স্বপ্ন ছিল একজন ভালো কবি হবার।

আর ইসলাম গ্রহণের পর তার স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল শহীদকে কেন্দ্র করে। নিজের কাব্য শক্তি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং সকল যোগ্যতাকে তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের পথে।

আল্লাহকে ভালোবেসে।

রাসূল (সা)-কে ভালোবেসে।

তার হৃদয়ের অদৃশ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল শহীদ হবার। আল্লাহ তাঁকে কবুল করেছেন।

একজন কবিও যে সত্যের পথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হতে পারেন– আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এদিক থেকেও তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস। ◎

www.pathagar.com

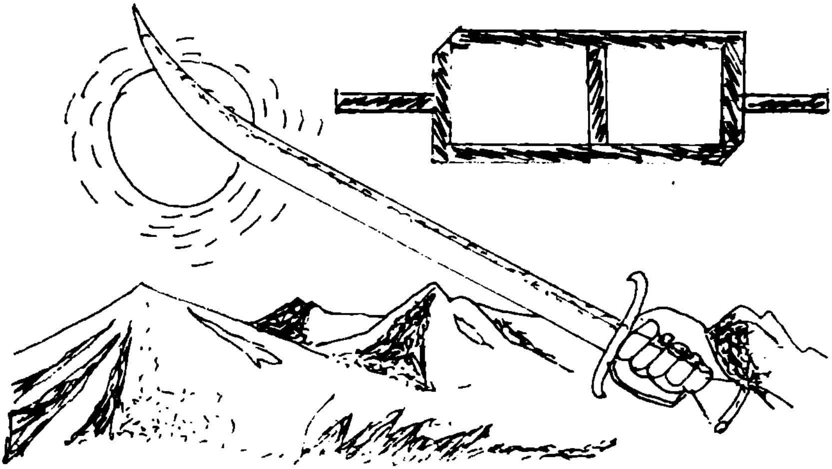

গোসল দিলেন ফেরেশতারা

লাল ডগমগে সূর্য।

সূর্যটা পূর্ব দিকের এক কোণে উঠে কেমন মুহূর্তেই পৃথিবীটাকে আলোচিত করে তুললো।

একটিমাত্র সূর্য!

অথচ তার এতো তেজ ? এতো জ্যোতি ?

বিস্ময়ের ব্যাপার বটে!

একাকী ভাবেন বসে হযরত হানজালা (রা)।

ভাবেন নীরবে। নির্জনে।

কিছুদিন যাবৎ কোনো কাজে কর্মেও তার মন বসে না। কেমন যেন আহত পাখির মতো বুকটা কেবলই তড়পায়।

তিনি দেখেন চারদিকে ইসলামের জোয়ার। দীনের আহ্বান।

www.pathagar.com

দেখেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মতো ইসলামের দিকে ছুটে আসছেন সোনার মানুষেরা।

ইসলামের সুগন্ধে চারপাশ মৌ মৌ করছে।

যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই নবী (সা)-কে নেতা মেনেছেন।

নবী মুহাম্মাদ (সা)।

যিনি এই দ্বীনি কাফেলার নির্ভীক সেনাপতি।

দীনের আলো যিনি সূর্যের মতো ছড়িয়ে দেন সারা পৃথিবীতে।

সেই নবী মুহাম্মদ (সা)-কে যে কতোবার দেখেছেন হানজালা (রা)!

কতোবার শুনছেন তাঁর কথা।

কতোবার দেখেছেন নবী (সা)-এর যুদ্ধ-সংগ্রাম।

তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি হানজালা (রা)।

তখনো বুঝে উঠতে পারেন নি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য।

তখনো জানেন না রাত আর দিনের পার্থক্য।

কিন্তু সময় তো আর থেমে থাকে না!

সময় এগিয়ে যায় স্রোতের মতো।

বাঁধ ভাঙ্গা তুফানের মতো।

হানজালার হৃদয়ে ঝড় বয়ে যায় প্রচণ্ড গতিতে।

যে ঝড়ে ভেঙ্গে চুরে তছনছ হয়ে যায় অন্ধকারের পাহাড়-পর্বত।

ঝড়ের গতিতে ছিঁড়ে যায় অন্ধকারের সকল কালো পর্দা।

যখন অন্ধকার চলে যায় তখন কেবল আলো আর আলো।

তখন চারদিকে রূপোর টাকার মতো কেবল চকচকে শাদা আর শাদা। অন্ধকারের গর্তে মুখ লুকিয়ে থাকতে কারই বা আর ভালো লাগে? কোনো বুদ্ধিমান কি আর চায় আলো ছেড়ে অন্ধকারকে আঁকড়ে থাকতে?

আলোর সন্ধান পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো হানজালার তৃষিত হৃদয়।

ছুটে গেলেন নবী (সা)-এর কাছে। বললেন, 'হে রাসূল (সা) আমাকে পথ দেখান। সত্য-সুন্দরের পথ। পথ দেখান— আলোর পথ। আমি পিপাসার্ত। দীনের অমিয় ধারায় আমার পিপাসা দূর করে দিন। আমি ক্ষুধার্ত।

www.pathagar.com

ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমাকে দীনের আহার দিয়ে সে ক্ষুধা দূর করে দিন। আমাকে আপনার চলার পথের একজন সঙ্গী করে নিন, হে দয়ার নবী রাহমাতুল্লিল আ'লামীন!'

হানজালার প্রাণের আকুতি দেখে খুশি হলেন রাসূল (সা)।

তাকে টেনে নিলেন ইসলামের শীতল ছায়ায়।

ইসলাম কবুল করার পর প্রশান্ত হয়ে গেল হানজালার হৃদয়।

থেমে গেল তার হৃদয়ের সকল অশুভ দাপাদাপি।

জুড়িয়ে গেল দেহ-মন।

তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসলেন নবী (সা)-কে।

ভালোবাসলেন ইসলামকে।

একান্তভাবে ভালোবাসলেন সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনকে।

ইসলাম গ্রহণের পর।

তখনো হানজালার হৃদয়ে একটি পিপাসা অপূর্ণ ছিল। সে পিপাসা অন্যরকম। সে এক আশ্চর্য পিপাসা।

সে পিসাসা মেটে না কোনো পানিতে।

সে পিপাসা মেটে না কোনো শরবতে।

সে পিপাসা মেটে না অন্য কিছুতেই।

হানজালার সেই পিপাসাটি হলো– শহীদ হবার পিপাসা!

আল্লাহ পাক অনেক ভালোবাসতেন হানজালাকে।

অবশেষে তিনি কবুল করলেন হানজালার আন্তরিক মুনাজাত।

ডাকার মতো ডাকলে, বান্দার ডাকে সাড়া না দিয়ে কি পারেন রহমতের সাগর—মহান স্রষ্টা?

হানজালা সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে।

সারাদিনের ক্লান্তির পর তিনি রাতে বিশ্রামের জন্যে ঘরে গেলেন। ঘরে আছেন তার স্ত্রী। আরো আছে কলিজার টুকরো সন্তান।

স্ত্রীর সাথে তিনি একান্তে কিছুটা সময় কাটালেন। সারাদিনের পরিশ্রমের ঘাম মুছে তিনি একটু আরাম করছিলেন।

ঠিক এমনি মুহূর্তে।

www.pathagar.com

এমনি মুহূর্তে তার কানে একটি শব্দ ভেসে এলো---

'ঘর থেকে বেরিয়ে এসো সত্যের মুজাহিদ! চলো যাই জিহাদের ময়দানে। ঐ শোনো, উহুদ পর্বত ডাকছে. ডাকছে বুলন্দ আওয়াজে। আর আরাম নয়। আর বসে থাকা নয়।'

জিহাদের ডাক শোনার সাথে সাথেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হযরত হানজালা (রা)।

স্ত্রী বললেন, 'অন্তত গোসলটা করে যান!'

হানজালা (রা) বললেন, 'গোসলের সময় নেই। শুনছো না জিহাদের ডাক ?'

তিনি মুহূর্তেই বিদ্যুতের গতিতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। জিহাদের উদ্দেশ্যে। উহুদের দিকে।

উহুদ প্রান্তর!

যুদ্ধ চলছে কাফেরদের সাথে।

কী ভীষণ যুদ্ধ!

হানজালা যুদ্ধ করছেন। প্রাণপণে। কাফেরদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে চলে যাচ্ছেন তিনি সম্মুখে।

তাঁর তরবারি দিয়ে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে।

কাফেরের কালো রক্তে ভিজে উঠছে সে তরবারি।

তিনি আরো ক্ষীপ্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন সম্মুখে ক্রমাগত।

তার চোখে তখন ইসলামের বিজয় স্বপ্ন।

কাফেরদেরকে পরাজিত করার স্বপ্ন।

সিংহের মতো এগিয়ে যাচ্ছেন হযরত হানজালা।

কাফেরদের মস্তক দিখণ্ডিত করে। বাধার প্রাচীর ভেদ করে।

হানজালার যুদ্ধ কৌশল আর বীরত্ব দেখে সবাই হতবাক। সবাই তাকিয়ে আছেন তার তরবারির দিকে।

হঠাৎ পেছন থেকে এক কাফের চড়াও হলো হানজালার ওপর।

কাপুরুষের মতো পেছনে থেকে আক্রমণ করে দ্বিখণ্ডিত করলো হানজালার দেহ।

সাথে সাথে লুটিয়ে পড়লেন হযরত হানজালা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তার নামটি পরিচিত হবার আর একটি কারণ ছিল। সে হলো– তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর আপন চাচা।

নাম—হামযা।

নবী (সা) মক্কায় ইসলাম প্রচার করছেন গোপনে। গোপনে হলেও হামযার কানে গেছে কথাটি। কিন্তু শিকার প্রিয় এই মানুষটি সে কথার দিকে কখনো ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তিনি তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। শিকার আর ভ্রমণের নেশাতেই মশগুল।

শিকার থেকে ফিরছেন হামযা।

ক্লান্তি আর অবসাদ নেমে এসেছে সারা শরীরে। দীর্ঘ পরিশ্রমে তিনি ঘেমে উঠেছেন। তাঁর বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন। ভাবছেন, আর এই সামান্য পথটুকু। তারপরই একটানা বিশ্রাম। তিনি ভাবছেন আর সামনে এগুচ্ছেন।

ঠিক এ সময়ে সাফা পাহাড়ের কাছ থেকে ছুটে এলো এক দাসী। দাসীর চোখে মুখে আতঙ্ক।

হামযা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে ? তুমি এমন করছো কেন ?'

দাসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'ইস্! একটু আগে যদি আসতেন তাহলে দেখতেন!'

'তার মানে? কি দেখতাম ?'

দাসী বললো, 'আপনার ভাতিজা—মুহাম্মাদ (সা)-এর করুণ অবস্থা।'

হামযা চোখ লাল করে বললেন, 'কেন ? কি হয়েছে আমার ভাতিজার ?'

দাসী আফসোস করে বললো, 'ঐ যে পাপীষ্ঠ আবু জেহেল! সে আপনার ভাতিজাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে।'

'কোথায় ?'

'কা'বার পাশে। মুহাম্মাদ (সা) এ সময়ে মানুষের মাঝে দীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তাদেরকে ডাকছিলেন আল্লাহর পথে। সত্যের পথে। আর ঠিক সেই সময়ে আবু জেহেল সেখানে উপস্থিত হলো। তারপর খুব বিশ্রী ভাষায় আপনার ভাতিজাকে গালমন্দ করলো। মুহাম্মাদ (সা) আবু জেহেলকে কিছু না বলে ফিরে চলে গেছেন। আহ্, উনি মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন।'

হাজার হোক আপন ভাতিজা।

রক্তের টান।

www.pathagar.com

মুহূর্তেই রাগে আর ক্ষোভে টান টান হয়ে উঠলো হামযার দেহ। দু'চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রক্তে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের দাবানল। এতো বড়ো সাহস! আমার ভাতিজাকে গালমন্দ!

হামযা দ্রুতবেগে ছুটে চললেন কা'বার দিকে। আবু জেহেলকে সামনে পেয়েই তার মাথায় তিনি ধনুক দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন। আঘাতের চোটে আবু জেহেলের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

এ দৃশ্য দেখলো আশেপাশের লোকজন। তারা বুঝলো, এটা ভাতিজাকে অপমান করার প্রতিশোধ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, 'হামযাও কি শেষ পর্যন্ত ধর্মত্যাগী হলো ?'

হামযা তখনো ক্রোধে ফুঁসছেন। তার বিশাল বুকের ছাতি তখনো কামারশালার হাপরের মতো ওঠানামা করছে। প্রতিশোধের জন্যে তখনো তার রক্তে কম্পন উঠছে। হামযার কানে গেল তাদের ধর্মত্যাগের কথাগুলো।

আর সাথে সাথেই তিনি ফিরে দাঁড়ালেন তাদের দিকে। সিংহের মতো।

তারপর মেরুদণ্ড টানটান করে জোরে জোরে তাদেরকে শুনিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আমি আমার পুরনো ধর্ম ত্যাগ করেছি। আমি ইসলাম কবুল করেছি। আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রচারিত দীন সত্য। সেই সত্যকে আমি গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! আমি সেই সত্য থেকে ফিরে আসতে পারিনে। কে আমাকে ফেরাবে ? সাধ্য থাকলে সামনে এসো! সাহস থাকলে ফেরাও আমাকে!'

হামযার হুংকারে সবাই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল। তাদের বুক শুকিয়ে হিম হয়ে গেল।

কেউ সাহস করলো না তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে।

রাত অনেক গভীর।

চারদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই।

শান্ত প্রকৃতির হামযাও এখন অনেকটা সুস্থ। তাঁর ভেতর সেই রাগ আর নেই।

এ সময়ে তাঁর মনে পড়লো। মনে পড়লো তাঁর সেই বজ্রদীপ্ত ঘোষণার কথা। ইসলাম কবুলের কথা।

www.pathagar.com

তখন রাগের মাথায় কথাগুলো বললেও এখন তিনি ভাবছেন, এ আমি কি করলাম ? আমি তো এখনো মুহাম্মাদের (সা) দীন গ্রহণ করিনি ? তাহলে?

একান্তে নির্জনে ভাবছেন হামযা (রা)।

একদিকে তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্ম। আর অন্য দিকে ভাতিজা মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর সত্য দীন ইসলাম।

কোন্ দিকে যাবেন তিনি ?

কোন্‌টিকে গ্রহণ করবেন ?

এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়লেন হামযা।

দ্বিধা আর সংশয় তার চোখে মুখে।

তিনি ভাবতে ভাবতে উদাস মনে প্রবেশ করলেন কা'বার ভেতর। তারপর–

তারপর হাত উঠালেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে।

কেঁদে জানালেন তিনি তার মনের আকুতি। বললেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি দূর করে দাও আমার মনের সকল দ্বন্দ্ব আর সংশয়। তুমি খুলে দাও আমার চোখের সামনে তোমার সত্যের চূড়ান্ত দীপশিখা। আমাকে কবুল করো হে আমার মহান স্রষ্টা!'

ধীরে ধীরে খুলে গেল কান্নারত হামযার চোখ। হাত দুটো নেমে এলো নিচে।

তার চোখে-মুখে খেলে গেল এক প্রশান্তির বিদ্যুৎ। সারা দেহে তিনি অনুভব করলেন এক অপার্থিব আরাম। পবিত্র হয়ে উঠলো তার হৃদয় এবং মন।

ইসলাম কবুল করে হামযা (রা) হাঁপ ছেড়ে পূর্বের সকল কালিমা আর ক্লান্তি ঝেড়ে ফেললেন। শুরু করলেন তিনি তার পূতপবিত্র এক নতুন জীবন।

হযরত হামযা!

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আরো বেশি সাহসী হয়ে উঠলেন।

তিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবলবেগে যুদ্ধ করে তাঁর সাহস আর বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

যুদ্ধের ময়দানে হামযা (রা) ছিলেন শত্রুপক্ষের জন্যে ভীষণ বিপজ্জনক। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী। প্রায় প্রতিটি অভিযানেই

www.pathagar.com

হামযার হাতে থাকতো ইসলামী ঝাণ্ডা। যে ঝাণ্ডা তাঁর হাতে তুলে দিতেন স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (সা)।

বদর যুদ্ধ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনো সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যুদ্ধ নামে খ্যাত।

১৭ই রমজান হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটনা।

এপাশে রাসূল (সা)-এর সাথে হামযাসহ দীনের কাফেলা।

সামনে যুদ্ধসাজে সজ্জিত কাফেরদের বিশাল বাহিনী।

উভয়পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

কাফেরদের দল থেকে তিনজন বাহাদুর বেরিয়ে এসে বললো, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে আমাদের সাথে মল্লযুদ্ধ করতে পারে?'

হামযা অনুমতি চাইবার দৃষ্টিতে তাকালেন ভাতিজা রাসূল (সা)-এর দিকে। রাসূল (সা) তাকে অনুমতি দিলেন।

সাথে সাথে হামযা (রা) হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফেরদের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা উতবা ইবনে রবীযার ওপর এবং উতবাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

এরপর কাফেররা শুরু করলো সর্বাত্মক যুদ্ধ।

তুমুল বেগে যুদ্ধ চলছে।

হামযা যেদিকে যান সেদিকেই সাফ।

তাঁর তরবারির সামনে দাঁড়াতে পারে না কেউ। তিনি সকল বাধা পায়ে দলে বীরদর্পে এগিয়ে যান ক্রমাগত সম্মুখে। তছনছ করে দেন শত্রুদের প্রাচীর ব্যূহ।

বদর যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত হলো কাফেরের দল।

বদর যুদ্ধে পরজয়ের পর কাফেররা ক্ষেপে গেল আরো দ্বিগুণ।

তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো নতুন নতুন কৌশলে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে।

তৃতীয় হিজরী সনে বিশাল বাহিনী নিয়ে ধাবিত হলো এবার তারা মদীনার দিকে।

হামযাসহ অন্যান্য যোদ্ধাকে নিয়ে রাসূল (সা) কাফেরদের গতিরোধ করতে এগিয়ে গেলেন। রাসূল (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে ওহুদ পাহাড়ের

www.pathagar.com

পাদদেশে কাফেরদেরকে পরাজিত করলেন। কাফেরদের মধ্যে ছিল এক বড় বাহাদুর। নাম সিবা ইবনে আবদুল উজ্জা। সে আহ্বান জানালো মল্লযুদ্ধের।

হামযা কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। বললেন, 'রে অধম! তুই এসেছিস আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ করতে?'

বলেই তিনি সিবাকে হত্যা করলেন।

এরপর শুরু হলো যুদ্ধ।

সে এক ভয়ানক যুদ্ধ!

ওহুদের এই যুদ্ধে হামযা একাই তিরিশ জন কাফের সৈন্যকে হত্যা করেন।

তিনি হত্যা করেন কুরাইশদের বড় বড় যোদ্ধা এবং নেতাকে। তিনি ছিলেন তাদের জন্যে এক ভীষণ আতঙ্ক।

কিন্তু কাফেররা ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তারা ভাবলো, সামনা সামনি লড়ে হামযাকে পরাস্ত করা যাবে না। অথচ, তাঁকে মারতে না পারলে কোনো যুদ্ধেই জয়ী হওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের বাহিনীকেও রক্ষা করা যাবে না।

তাহলে উপায়?

কাফেররা হামযাকে হত্যা করার কৌশল খুঁজতে থাকলো।

ওয়াহশী ছিল এক নির্যাতিত গোলাম। তার কাফের মালিক তাকে বললো, 'তুমি যদি হামযাকে হত্যা করতে পার, তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেব।'

কথাটি নিয়ে ভাবলো ওয়াহশী।

মুক্তি তার একান্ত কাম্য কিন্তু সে কিভাবে হামযাকে হত্যা করবে? তাঁর সামনে যাওয়া তো দূরে থাক, ছায়া মাড়ানোও বিপজ্জনক।

ভাবতে ভাবতে ওয়াহশী একটি উপায় খুঁজে বের করলো।

ওহুদের যুদ্ধ চলছে। হামযা বীরদর্পে লড়ে যাচ্ছেন। লড়তে লড়তে ক্রমাগত সামনে যাচ্ছেন। ঘাঁপটি মেরে লুকিয়ে ছিল ওয়াহশী। তার হাতে ছিল উন্মুক্ত তরবারি।

www.pathagar.com

সুযোগ বুঝে সে পেছন থেকে আঘাত করলো হামযাকে। গুপ্ত ঘাতকের তরবারির আঘাতে মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়লেন হযরত হামযা।

শাহাদাত বরণ করলেন এক অসামান্য সাহসী বীর।

হযরত হামযার শাহাদাতের পর শোকের ছায়া নেমে এলো নবী (সা)-সহ সকল মুসলমানের ভেতর। আর খুশি হলো কাফেররা।

তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে কুরাইশদের কাফের স্ত্রীরা আনন্দ সঙ্গীত গেয়ে উঠলো।

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা নাম্নী এক মহিলা হামযার নাক কান কেটে অলঙ্কার বানালো। তার বুক পেট চিরে কলিজা বের করে চিবালো।

এ কথা শুনে রাসূল (সা) খুব ব্যথিত হলেন। বললেন, 'হামযার দেহের কোনো অংশ কি ঐ মহিলা খেয়েও ফেলেছে?'

লোকেরা বললো, 'না।'

রাসূল (সা) বললেন, 'হামযার দেহের কোনো একটি অংশও আল্লাহ জাহান্নামে যেতে দেবেন না।'

হযরত হামযা!

এক অসীম সাহসী বীর যোদ্ধার নাম হামযা।

তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আল্লাহ, নবী (সা) আর সত্য দীনকে। দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যেই তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তার মতো সাহসী বীরের কোনো তুলনা হয় না। তার তুলনা তো কেবল তিনিই।◎

www.pathagar.com

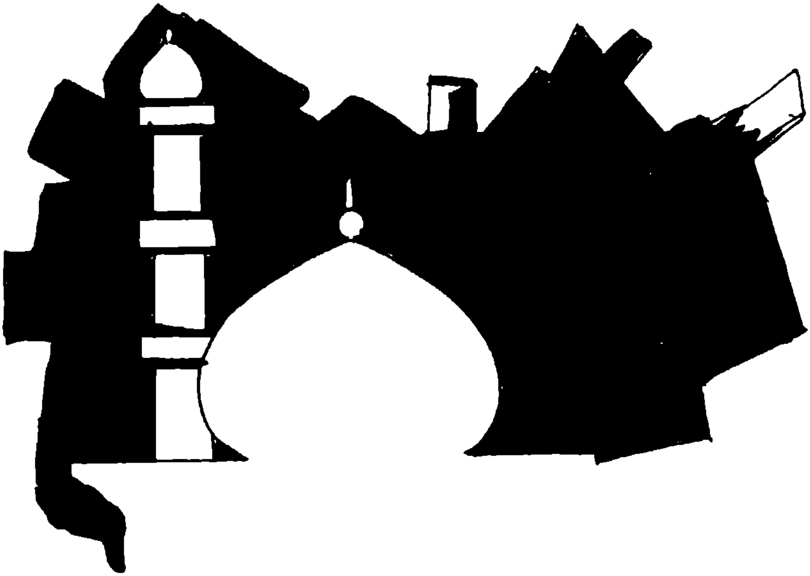

চোখ তো নয়, অলৌকিক আয়না

আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন।

ঘনঘোর অন্ধকার।

চারপাশ নীরব–নিস্তব্ধ।

গুমোট উত্তেজনা প্রকৃতির শরীরে।

ঠিক এমনি এক দুর্যোগময় রাত।

কেউ নামছে না সাহস করে রাস্তায়।

ওদিকে সময় হয়েছে এশার।

আর বসে থাকা নয়। বসে থাকতে পারেন না দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)। তিনি বেরিয়ে পড়লেন মজিদের পথে। একাকী।

প্রকৃতির বুকে তোলপাড়। কিন্তু প্রশান্ত, এক বেহেশতী আবহাওয়া কেবলি খেলে বেড়াচ্ছে মসজিদের ভেতর।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর উপস্থিতি সেই পরিবেশকে করে তুলেছে আরও মহিমান্বিত।

চারপাশে তাকান রাসূল (সা)।

না, ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখা যায় না। দেখা যায় না কোনো সাহাবীর হীরন্ময় মুখ। হঠাৎ আকাশের বুক ভেদ করে, মেঘের পালক থেকে ছিটকে পড়লো একফালি বিদ্যুৎ।

বিদ্যুতের সাতরঙা আলোয় মুহূর্তেই ভেসে উঠলো একটি প্রার্থিত মুখ। তার দিকে তাকাতেই জেগে উঠলো রাসূল (সা)-এর ঠোঁটে জাফরানি হাসি। ভেসে এলো কী মধুর, কী দরদের এক কণ্ঠস্বর—

'কাতাদা!'

কাতাদাও উপস্থিত হয়েছেন এশার নামাজে। এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে। বিস্ময়টা ওই খানে।

রাসূল (সা)-এর কণ্ঠে ছিল আবেগমিশ্রিত এক অপার বিস্ময়।

কাতাদা বললেন, 'জানি— আজ, মিষকালো অন্ধকার আর বৈরী আবহাওয়া। জানি— আজ, এশার জামায়াতে শামিল হবেন না তেমন বেশি মুসল্লি। কিন্তু আপনি আসবেন! এবং এক ধরনের নিঃসঙ্গতা যদি কষ্ট দিয়ে যায় কোনোভাবে আমার প্রাণপ্রিয় নবীকে। সইতে পারবো না! তাই চলে এসেছি হে দয়ার নবী চলে এসেছি মসজিদে। আপনার সান্নিধ্যের ছোঁয়া নিয়েই আদায় করবো আজ এশার সালাত।'

আবারও তাকালেন রাসূল (সা) কাতাদার দিকে। তিনি পাঠ করে নিলেন আবারও তাঁর প্রিয় সাথীকে। বললেন—

'কাতাদা! নামাজ শেষ করে ঘরে ফেরার সময় একবার আমার কাছে এসো।'

রাসূল (সা)-এর আহ্বান!

শিহরিত হলেন কাতাদা।

খুশিতে তরবারির মত খাড়া হয়ে উঠলো তার শরীরের প্রতিটি পশম। রাসূল (সা) ডেকেছেন! তাকে। কিন্তু কেন?

প্রতীক্ষার পালা শেষ।

কাতাদা হাজির হলেন রাসূল (সা)-এর সামনে।

কিন্তু কী আশ্চর্য!।

www.pathagar.com

একটি শুকনো খেজুরের ডাল তার দিকে এগিয়ে দিয়ে রাসূল (সা) বললেন, 'নাও ধরো! এটা হাতে থাকলে তোমার সামনে দশজন এবং পেছনের দশজন আলোকিত করতে থাকবে। আর বাড়ি পৌঁছে, ঘরের চারপাশে যদি দেখ কোনো অবাঞ্ছিত অন্ধকার, তাহলে—তাহলে কোনো কথা না বলেই এই ছড়ি দিয়ে আঘাত করবে সেখানে। সজোরে। কারণ, অন্ধকার মানেই শয়তান!'

আশ্চর্য এক ছড়ি!

আশ্চর্য তার ক্ষমতা!

কম কথা নয়। ঐ ছড়ির সাথে মিশে আছে স্বয়ং রাসূল (সা)-এর দোয়া। সুতরাং তার শক্তি—সে তো তুলনা বিহীন।

কাতাদার হাতে রাসূল (সা)-এর দেয়া দোয়ার ছড়ি। তিনি বাড়ি ফিরছেন! ফিরছেন অন্ধকার কেটে কেটে। বাড়ির কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালেন।

সত্যিই তো!

কী এক অদ্ভুত অন্ধকার জমে আছে ঘরের আঙিনায়।

সেই অন্ধকারের ভেতর ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে একটি প্রাণী। শক্ত লোমে আবৃত তার সারাটি দেহ। গোলাকৃতির। বেশ ছোট। ক্ষুদ্র প্রাণী। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও তার চোখে মুখে লেপ্টে আছে অশুভর ছায়া।

মনে পড়লো কাতাদার, মনে পড়লো তার রাসূল (সা)-এর কথা। তিনি সজোরে আঘাত করলেন। খেজুরের সেই শুকনো ছড়ি দিয়ে। আর তখন, তখনই পালিয়ে গেল সেই আশ্চর্য রহস্যময় কুৎসিত প্রাণীটি।

রাসূল (সা) খুবই মহব্বত করতেন কাতাদাকে।

আর কাতাদা?

তার ভালোবাসায়ও ছিল না এতটুকু খাদ।

প্রাণের সকল আবেগ দিয়ে, সকল ইচ্ছা দিয়ে সকল স্বপ্ন এবং ত্যাগ দিয়ে তিনি ভালোবেসেছিলেন পরমপ্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে।

কেমন ছিল এ ভালোবাসার স্বরূপ?

কেমন ছিল তার নজরানা?

সেও বিস্ময়কর এক ইতিহাস!

www.pathagar.com

উহুদ যুদ্ধ!

ভয়ানক এক যুদ্ধ!

মুসলিম বাহিনীর ওপর নেমে এসেছে তখন এক সংকটের কালো প্রহর।

মুসলিম মুজাহিদরা ছত্রভঙ্গ। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তারা পরস্পর থেকে।

মুশরিকরা দেখলো, এই তো সুযোগ। এই তো সুযোগ বটে- রাসূল (সা)-কে আঘাত করার।

মুশরিক তীরন্দাজদের লক্ষ্য কেবল রাসূল (সা)-এর মস্তক।

দয়ার নবী (সা)-কে তাক করে বৃষ্টির মত তীর ছুঁড়ছে তারা।

কঠিন ঢালের মত রাসূল (সা)-কে আগলে রেখেছেন কয়েকজন মুজাহিদ। তারা তাদের পর্বতের মত এক একটি বুক পেতে দিয়ে রুখে দিচ্ছেন মুশরিকদের জঘন্য তীর।

এভাবে, একে একে শহীদ হলেন দশজন মুজাহিদ।

এবার পালা এলো কাতাদার।

দেরি না করে রাসূল (সা)-কে পেছনে আড়াল করে সামনে দাঁড়ালেন অসীম সাহসী কাতাদা। ওহুদ পর্বতের মত খাড়া করে, পেতে দিলেন বুক মুশরিকদের দিকে। নাও, তীরের ফলায় ঝাঁঝরা করো আমাকে।

এতটুকু টলেনি তার বুক।

কাঁপেনি পায়ের পাতা।

চোখে ছিল না কোনো দ্বিধার কুয়াশা।

তিনি দাঁড়িয়ে আছেন রাসূল (সা)-কে আড়াল করে। মুশরিকদের দিকে।

হঠাৎ একটি তীর ছুটে এলো বিদ্যুৎগতিতে। এবং বিধে গেল তার একটি চোখের কোটরে।

এবং মুহূর্তেই কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো চোখটি। তারপর- তারপর মুক্তোর দানার মত সেটা ঝুলে পড়লো কাতাদার গণ্ডদেশে।

অসম্ভব নয়। চোখটি তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে। আস্তে করে ধরে ফেললেন কাতাদা নিজেরই হাত দিয়ে। রাখলেন বহুক্ষণ মুঠোর ভেতর। সাথীরা বললেন, 'ফেলে দাও। ফেলে দাও ঐ খণ্ডিত চোখ।'

কিন্তু না, ফেললেন না কাতাদা।

মুঠি ভরে তুলে ধরলেন সেটা রাসূল (সা)-এর সামনে।

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর কাছে আরজ জানালেন হৃদয়ের তাবৎ উচ্ছ্বাস দিয়ে।

রাসূল (সা) দেখলেন চোখটি। নক্ষত্রের মত কেমন জ্বলজ্বল করছে সেটা কাতাদার রক্তভেজা হাতের মুঠোয়।

ঐ চোখ যেন কথা বলছে দয়ার নবী (সা)-এর সাথে। অত্যন্ত সংগোপনে।

একটি অব্যক্ত কম্পন উঠলো রাসূল (সা)-এর কোমল হৃদয়ে।

তিনি হাত বাড়ালেন কাতাদার দিকে। তুলে নিলেন নিজের হাতে কাতাদার চোখটি।

তারপর! তারপর আবার সেটা লাগিয়ে দিলেন তার আগের স্থানে, কাতাদার চোখের কোটরে। এবার দোয়া করলেন রাসূল (সা)–

'হে আল্লাহ্! কাতাদা তার মুখমণ্ডল দিয়ে তোমার নবী (সা)-কে রক্ষা করেছে। সুতরাং এখন তুমি তার এ চোখটিকে অন্য চোখের চেয়েও সুন্দর করে দাও। করে দাও আরও বেশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।'

রাসূল (সা)-এর দোয়া কি আর বৃথা যায় কখনো?

সত্যিই, তারপর কাতাদার সেই চোখটিই হয়ে উঠলো অন্যটি অপেক্ষা আরও বেশি সুন্দর। আরও বেশি তীক্ষ্ণ।

কাতাদাকে দেখলে মনে হত– আহ্! চোখ তো নয় যেন জাদুর দূরবীন। কিংবা সূর্যস্নাত অলৌকিক আয়না।

ভালোবাসার নজরানা!

কিন্তু কী বিস্ময়কর ছিল সেই মূহূর্তটি!

এখনো প্রজ্জ্বল। প্রজ্জ্বল হয়ে আছে সেই ত্যাগের মহিমা সোনালী ইতিহাসের পাতায় পাতায়।◎

www.pathagar.com

ফাঁসির মঞ্চে হাসেন তিনি

সময়টা খুব খারাপ তখন। অন্তত মিসরের জন্য।

মিসর সরকারের তখন চলছে দোর্দণ্ড প্রতাপ।

স্বৈর শাসনের এক অগ্নিময় প্রশ্বাস তখন মিসরকে ঘিরে রেখেছে আষ্টেপৃষ্ঠে।

সরকারের বিরুদ্ধে টুশব্দটি পর্যন্ত করার কারুর সাহস নেই। সবাই ভয়ে থরথর। কম্পমান। না জানি কখন নেমে আসে জালিমের নির্যাতন।

কী এক দুঃসময় চলছে তখন মিসরের বুক জুড়ে।

কোথাও এতটুকু নীতি নেই, সত্যি নেই।

শান্তি নেই। নেই মানবতার লেশ। আছে কেবল হত্যা। আছে খুন। আছে লুটতরাজ। আর আছে নারকীয় সন্ত্রাস।

জালিম শাসকের ত্রাসে কাঁপছে মিসর। কাঁপছে মিসরের গাছের পাতারাও।

www.pathagar.com

সবাই। উদ্বিগ্ন।

ঠিক এমনি সময়ে, মিসরের হৃৎপিণ্ড থেকে হঠাৎ একটি একটি প্রতিবাদের ফুলকি জ্বলে উঠলো।

প্রতিবাদের ফুলকি!

অথচ তাতে মেশানো ছিল বারুদের চেয়েও মারাত্মক এক শক্তি। কেননা, প্রতিতবাদী ব্যক্তিটাও যে অনেক–অনেক বড় মাপের মানুষ।

সেই প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গের নাম– আবদুল কাদের আওদা।

আবদুল কাদের আওদা ছিলেন মিসর সরকারের একজন জজ। অর্থাৎ বিচারক। বিচারকের কাজ হলো– বিচার করা।

ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করা।

তারপর দোষী ব্যক্তির শাস্তির ফয়সালা দেয়া।

জজ আবদুল কাদেরের মনে হলো, কী হাস্যকর ব্যাপার! আমি বিচারক। বিচার করাই আমার কাজ। কিন্তু আমি আজ বিচার করবো কার? স্বয়ং শাসকই যেখানে জালিমের সম্রাট। যখন সকল অন্যায়কে তিনি তার ইচ্ছার চাবুক দ্বারা ন্যায়ে পরিণত করেছেন– তখন, তখন আর বিচার করবো কাকে?

আবদুল কাদের আওদার বুকটা কেঁপে উঠলো ভয়ে। না, শাসকের ভয়ে নয়। আল্লাহর ভয়ে। তাঁর কাছে কৈফিয়ত এবং শাস্তির ভয়ে।

তিনি দেখছেন চারপাশে চলছে অসত্য আর অন্যায়ের বন্যা। স্বার্থ পূজায় ভরে গেছে দেশ। ব্যক্তি সুবিধা, মিথ্যা আর জুলুমটা আইনের মোড়কে ন্যায় বানানোর চেষ্টা চলছে। গরীব-দুঃখীর কষ্টার্জিত সম্পদ গ্রাস করছে। তাদের পিঠে পড়ছে অন্যায়ভাবে চাবুকের আঘাত। কেউ সামান্য টু-শব্দ করলেই ঘাড় থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে তার গর্দান। এই যখন একটি দেশের অবস্থা, তখন-না! কোনো ক্রমেই সেই দেশের জজের পদে বহাল থাকা একজন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

আবদুল কাদের আওদার হৃদয়টা কেঁদে উঠলো। কেঁদে উঠলো বেদনায়। শোকে। দুঃখে।

ভাবলেন, না! আর একমুহূর্তও নয়। এই জালেম সরকারের জজপদে থাকা আদৌ সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এই সরকারের সাথে থাকা মানে, তার যাবতীয় পাপের সাথে শরীক হওয়া। তার অন্যায়কে মেনে নেয়া। তার জুলুম আর অত্যাচারের অংশীদার হওয়া। কিন্তু এসব মেনে নেয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

সুতরাং পদত্যাগই একমাত্র রাস্তা। কালবিলম্ব না করে জজের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন আবদুল কাদের আওদা।

সরকার তাকে কাছে টানার জন্য সম্পদের লোভ দেখালো। দেখালো আলো ঝলমল সুখের রাস্তা।

কিন্তু সিদ্ধান্তে অটল আবদুল কাদের।

কোনো প্রলোভনেই এতটুকু টললেন না তিনি।

টলবেন কেন?

যার ভেতরের ঈমান পর্বতের মত সুদৃঢ়।

যার আছে আল্লাহর ভয়।

যার আছে কিয়ামতে জবাবদিহীর ভয়।

যার আছে পরিণামে শাস্তির ভয়।

তিনি কি দুনিয়ার কোনো স্বার্থেই সত্য থেকে পিছে হঠতে পারেন? পারেন কি স্বার্থ কিংবা সুখের লোভে আখেরাতকে কুরবানী দিতে? পারেন না কখনো।

যেমন পারেন নি সাহসী এক বিচারক–আবদুল কাদের আওদা।

মিসরে, সেই সময়ে একটি দল, সরকারের এসব অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানালো। দলটির নাম– 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'।

তারা সত্যের সৈনিক।

তাদের পথ একমাত্র দীনের পথ।

রাসূল (সা)-এর দেখানো পথ।

তাদের দিলে একমাত্র ভয়-আল্লাহর ভয়।

তারাই সিংহের মত গর্জে উঠলেন। গর্জে উঠলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর সংগ্রাম চালালেন জালেম শাসকের প্রতিপক্ষে।

সত্যি বলার কারণে তাদের ওপর নেমে এলো অন্ধকারের তীব্র ত্রাস।

তাদেরকে বন্দী করা হলো।

নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেয়া হলো।

www.pathagar.com

কাউকে আবার ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করাও হলো।

আবদুল কাদের এসব দেখলেন। দেখলেন আর ভাবলেন, 'এও কি সম্ভব? কোনো সভ্যসমাজে এতটা হিংস্র পশুর মত আচরণ করা কি সম্ভব?'

কি দোষ করেছে তারা?

তারা তো কোনো দোষ করেনি।

সত্য বলা কি অপরাধ?

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কি অপরাধ?

এসব ভাবেন আর শিউরে ওঠেন আবদুল কাদের। নিজের ভেতর তি। দেখতে পান একটি সাহসের উপত্যকা।

তিনিও জ্বলে ওঠেন। বলেন, 'একটি দেশে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি স্বত্ত্বেও সরকার ও শাসকবর্গ পরিষ্কারভাবে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকবে, ইসলামের অনুসারীদের রক্তের জন্য হায়েনার মত হন্যে হয়ে উঠবে, এটা কি একজন বিচারকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? তার পক্ষে কি সহ্য করা সম্ভব যে, যারা আল্লাহভীতি আর পরহেজগারিকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আর এ জন্য সরকার তাদের উৎপীড়ন করবে। নির্যাতন করবে কিংবা হত্যা করবে?'

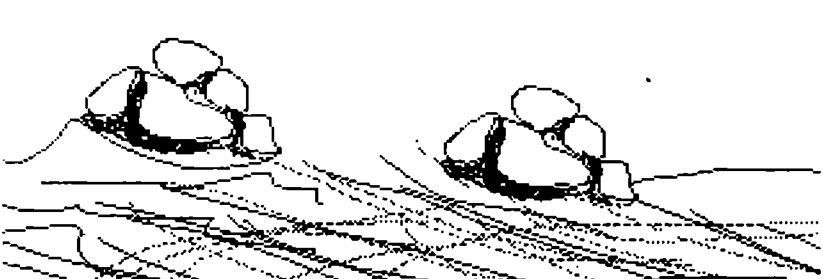

www.pathagar.com

'না, এটা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।'

সহ্য করা যায় না যে, সরকার সত্যের সৈনিকদেরকে হত্যা করবে আর অন্যায় ও অসত্যকে গ্রহণ করবে, পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

আবদুল কাদের আওদা জজের পদ থেকে পদত্যাগ করার পর এবার নিজেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন।

তার প্রতিবাদের লাল শিখায় আলোকিত হয়ে উঠলো মিসরের বহুদূর পর্যন্ত।

কিন্তু ক্ষেপে গেল শাসকবর্গ।

যাবারই তো কথা।

সত্যকে হজম করা চাট্টিখানি কথা নয়।

অন্তত দুনিয়া পূজারীদের জন্যে তো সেটা আরও কঠিন ব্যাপার।

সুতরাং সত্য বলার কারণে, প্রতিবাদ করার কারণে তার ওপর নেমে এলো ঘনঘোর অন্ধকার।

অত্যন্ত-নির্মম নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন চালালো তার ওপর।

নির্যাতন চালায় আর বলে– এখনো ফিরে আসুন। এখনো সময় আছে।

কিন্তু, না। সত্য থেকে ফিরে আসেন নি তিনি।

তাদের সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন তারা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলেন তাকে।

ফাঁসির মঞ্চে আবদুল কাদের আওদা।

হাসেন তিনি জালিমের মূর্খতা দেখে।

হাসেন তিনি মূর্খদের আসফালন দেখে।

আর হাসেন তিনি নিজেকে সত্যের কাছে সমর্পণ করতে পারার অশেষ আনন্দে।

ফাঁসিতে শাহাদাত বরণ করলেন আবদুল কাদের আওদা।

কিন্তু তখনো, তখনো তার কোমল ঠোঁটে লেগেছিল জোছনাপ্লাবিত স্মিত হাসির সেই সোনালী আভা।

না, কোনো অত্যাচারই শেষ পর্যন্ত সত্যের আভাকে ম্লান করতে পারে না। কক্ষণো না।◎

www.pathagar.com

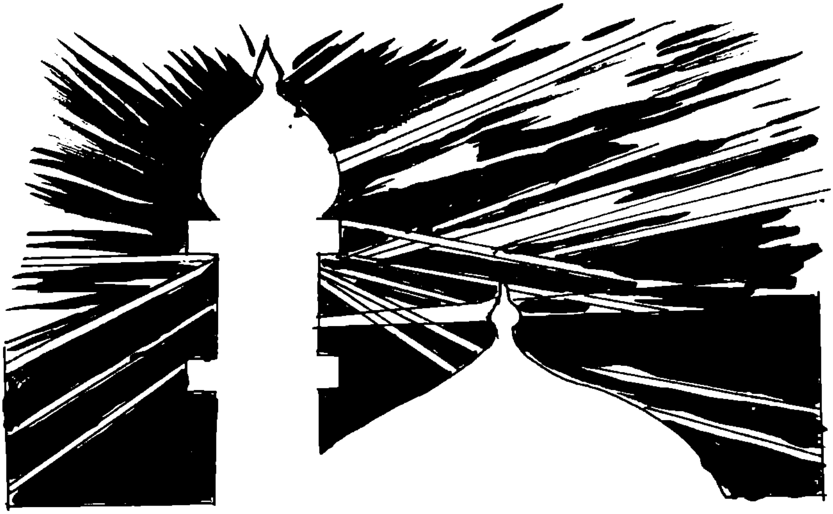

বিরল পুরুষ শক্ত খিলান

হিজরী সনের আগের কথা।

তখনো নামাজ ছিল। কিন্তু ছিল না আযানের প্রচলন ছিল না নির্দিষ্ট সময়ে নামাজীদের একত্রিত করার কোনো সুন্দর ব্যবস্থা।

এই এক মহাসমস্যা।

নামাজ হবে, কিন্তু ডাকার পদ্ধতি কারো জানা নেই। তাহলে কীভাবে সবাই একত্রিত হবে নামাজের সময়ে? একই কাতারে কীভাবে দাঁড়াবে তারা?

ভাবনার বিষয় বটে।

সমস্যাটি আরো বড় হয়ে দেখা দিল তখন, যখন দয়ার নবীজী মদীনায় তৈরি করলেন মসজিদে নববী।

তিনি বসলেন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে।

আকাশ গোল হয়ে বসে আছে মাথার ওপর।

নক্ষত্রেরা জ্বলছে আপন জ্যোতিতে।

www.pathagar.com

পূর্ণিমার চাঁদটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে রাসূল (সা)-এর দিকে।

দীর্ঘ নীরবতা নয়।

রাসূল (সা) তাকালেন মমতার দৃষ্টিতে।

সাহাবীরা নড়ে উঠলেন। সবাই ঝুঁকে পড়লেন প্রাণপ্রিয় নেতার দিকে।

তাহলে কি করা যায়?

কীভাবে ডাকা যায় মানুষকে নামাজের দিকে?

রাসূল (সা) জানতে চাইলেন বিজ্ঞ বন্ধু-সাহাবীদের কাছে।

সাহাবীরাও পেরেশান।

চিন্তার কুচি কুচি ভাঁজ তাদের চোখে মুখে।

ভাবছেন আর ভাবছেন।

উপস্থিত সাহাবীরা একে একে বলে গেলেন তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ।

রাসূল (সা) শুনেছেন। শুনছেন গভীর মনোযোগের সাথে। শুনছেন আর পরখ করে দেখছেন বাস্তবতার নিরীখে।

কেউ বললেন, 'নামাজের সময় হলে মসজিদের ছাদে, লম্বা করে পতাকা উড়িয়ে দেয়া হোক। তাহলে কাছের এবং দূরের-সবাই জানতে পারবে, হ্যাঁ, এবার নামাজের সময় উপস্থিত।'

কেউ বললেন, 'না। পতাকার দিকে সবার দৃষ্টি নাও তো যেতে পারে। কর্মব্যস্ত মানুষ। একটু বেখেয়াল হলেই তারা হারাবে জামায়াতের ফায়দা। এমন কি বঞ্চিত হতে পারে নামাজ আদায় থেকে। তার চেয়ে এই ভালো– ঘণ্টা বাজানো হোক।'

হ্যাঁ, যখনই নামাজের সময় উপস্থিত হবে, সাথে সাথেই বেজে উঠবে ঘণ্টাটি। তাহলে মানুষ যতই কর্মব্যস্ত কিংবা বেখেয়াল থাকুক– ঘণ্টার আওয়াজ কানে গেলেই বুঝে যাবে, এই তো সময় এখন মসজিদে যাবার। এইতো সুযোগ এখন জামায়াতে নামাজ আদায় করে নিজেকে পূর্ণ করে তোলার।

পদ্ধতিটা মন্দ নয়, ভাবলেন কেউ।

কেউ বললেন, 'না। তার চেয়ে শিঙ্গা ফুঁকানো হোক নামাজের সময়।'

কেউ বললেন, 'তার চেয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হোক-নামাজের সময় উপস্থিত।"

www.pathagar.com

রাসূল (সা) শুনছেন সবার কথা। শুনছেন আর ভাবছেন, তা কী করে হয়! শিঙ্গা কিংবা আগুন জ্বালানো– না! এসবই তো ইহুদী-নাসারাদের কাজ। সুতরাং নামাজের আহ্বানের জন্য এসব পদ্ধতি কিছুতেই চলতে পারে না।

তাহলে ঘণ্টা বাজানো?

বিষয়টি নিয়ে ভাবা যায় বটে।

সাহাবীরা একমত– ঘণ্টা বাজিয়ে জানানো যায় মানুষকে।

ডাকা যায়– এসো নামাজের জন্য। মসজিদে।

প্রস্তাবটির ব্যাপারে রাসূল (সা)-ও সম্মত হলেন তাৎক্ষণিকভাবে।

এটা কিছুটা মন্দের ভাল বলে মনে হল।

এবার অনুমতি দিলের রাসূল (সা)। অনুমতি দিলেন ঘণ্টা বাজানোর জন্য।

প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।

সুতরাং সভার কাজ শেষ।

আগামী দিন থেকে মানুষকে ডাকা হবে। নামাজের জন্য ডাকা হবে ঘণ্টা বাজিয়ে।

এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাসূল (সা)-এর আর একজন প্রিয় সাহাবী।

নাম– আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ।

সবার মত আবদুল্লাহও ফিরে এলেন সভা শেষে।

নিজের ঘরে।

দিনের সূর্য বিদায় নিয়েছে অনেক আগে।

থমথমে রাত। গভীর থেকে আরও গভীরে যাচ্ছে রাতের শরীর।

সবাই ঘুমিয়ে আছে।

ঘুমিয়ে আছে সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীর নিয়ে।

আবদুল্লাহও ঘুমিয়ে আছেন।

রাত বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে রাতের গভীরতা এবং নিস্তব্ধতা।

এমনি সময়!

এমনি এক সুন্দর সময়ে হঠাৎ আবদুল্লাহ স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন–

ঘণ্টা হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন ব্যক্তি।

আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঘণ্টাটি বিক্রি করবে?

www.pathagar.com

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ঘণ্টা দিয়ে আপনি কি করবেন?

আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, 'নামাজের সময় এটা বাজাবো। এটাই আমাদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাছাড়া নামাজের জন্য মানুষকে ডাকার আর তো কোনো পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।'

আবদুল্লাহর কন্ঠ থেকে অসহায়ের বৃষ্টি ঝরে পড়লো কিছুটা।

তার কথা শুনে লোকটি বললো, 'ঘণ্টা বাজানোর চেয়ে খুব ভালো পদ্ধতি আমার কাছে আছে।'

'আছে?' আনন্দ আর বিস্ময়ে শিউরে উঠলেন আবদুল্লাহ।

'হ্যাঁ, আছে।' লোকটি দৃঢ়তার সাথে বললো। তারপর আবদুল্লাহকে কাছে, আরো কাছে আহ্বান জানালো।

ঝুঁকে পড়লেন তার দিকে আবদুল্লাহ।

তারপর–

তারপর লোকটি তাকে শিখিয়ে দিল আযানের প্রতিটি পদ এবং বাক্য। স্পষ্ট উচ্চারণ করে করে।

স্বপ্নের পালা শেষ।

শেষ হয়েছে রাতেরও।

প্রভাতের প্রথমেই, তখনও জাগেনি সূর্য। জাগেনি কর্মচঞ্চল পৃথিবী।

জমেনি পথে-প্রান্তরে মুখর কলরব।

ঠিক এমনি এক শান্ত, শীতল আর ততোধিক মনোমুগ্ধ সময়ে ছুটলেন আবদুল্লাহ।

ছুটলেন স্বপ্নের বারতা নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে। আনন্দে কাঁপছে তার উজ্জ্বল দুটি ঠোঁট। চিক চিক করছে চোখের পাঁপড়ি। কী এক উত্তেজনার আর টান টান আবেগ! থেকে থেকেই শিউরে উঠছে তার পবিত্র শরীর।

মাথার ওপরে শাদা শাদা মেঘের ভেলা।

ফুরফুরে বাতাস তাকে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে আলতোভাবে।

আবদুল্লাহ অলৌকিক এক সুসংবাদ পাঁজরের গোপন সিন্দুকে চেপে ছুটে চলেছেন প্রাণপ্রিয় নেতার কাছে। সিন্দুকে সুরক্ষিত আছে মহামূল্যবান সম্পদ। যে সম্পদ দেখানো যাবে কেবল বিশ্বস্ত এক বন্ধুকে।

রাসূল (সা) বসে আছেন। শান্ত, উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ পৌঁছে গেছেন রাসূল (সা)-এর দরবারে। তখনো তিনি হাঁপাচ্ছেন। খুব দ্রুত ওঠানামা করছে তার শ্বাস-প্রশ্বাস।

তার উপস্থিতিতেই রাসূল (সা– বুঝে গেলেন অনেক কিছু।

তবুও তিনি বললেন রাসূল (সা)–কে। বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা।

শোনালেন স্বপ্নের মধ্যে শেখা সেই মধুর আযানের কথামালা।

রাসূল (সা) শুনলেন। শুনলেন আযানের প্রতিটি শব্দ। প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি ধ্বনির কারুকাজ।

শোনার সাথে সাথেই রাসূল (সা) বললেন, ঠিক আছে। তোমার এই স্বপ্ন সত্য। আর দেরি নয়। তুমি যাও। যাও বিলালের কাছে। তাকে শিখিয়ে দাও। সে আযান দিক।

রাসূল (সা)-এর অনুমোদন এবং অনুমতি পেয়ে খুশিতে দুলে উঠলেন আবদুল্লাহ।

তিনি ছুটলেন এবার বিলালের দিকে।

বিলালকে শিখিয়ে দিলেন আযানের প্রতিটি পদ এবং বাক্য। ঠিক যেভাবে তিনি শিখেছিলেন ঘুম ঘুম স্বপ্নের মধ্যে।

বিলালও দ্রুত শিখে নিলেন। এবং তারপর–

তারপর তিনি আযান দিলেন মসজিদে নববীতে।

ইসলামের প্রথম আযান!

প্রথমই উচ্চারিত হলো— আযানের সুমধুর ধ্বনি।

প্রথমবারের মত মানুষের কানে পৌঁছুলো এক অভাবনীয় সুললিত উচ্চারণ।

সবাই তো অবাক!

অবাক আর বিস্ময় নিয়ে সবাই ছুটছে মসজিদের দিকে। ব্যাপার কি!

বিলালের কণ্ঠে আযান শুনেছেন উমর (রা)-ও।

শুনেই তিনি গায়ের চাদর টানতে টানতে ছুটে গেলেন রাসূল (সা)-এর কাছে।

বললেন, 'হে দয়ার নবী! আল্লাহর কসম! আমি শুনেছি। শুনেছি কাল রাতে স্বপ্নযোগে এই মধুর বাক্যগুলো।'

শুকরিয়া জানালেন আল্লাহর রাসূল (সা)। শুকরিয়া জানালেন দু'জন মু'মিন-মুসলমানের স্বপ্নের মিলের জন্য।

www.pathagar.com

সত্যিই এক সুন্দর পদ্ধতি জানা গেল। যে পদ্ধতির সাথে এতটুকুও মেলেনা ইহুদী-নাসারা কিংবা অন্যদের। এমনি একটি পদ্ধতির জন্য সবাই উন্মুখ ছিলেন এতদিন।

রাসূল (সা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে শুকরিয়া জানালেন।

আর প্রসন্ন হলেন আবদুল্লাহর প্রতি।

আবদুল্লাহ!

কম ভাগ্যবান সাহাবী নন।

তাঁর মাধ্যমেই আযানের মত যুগান্তকারী কালজয়ী, সর্বকালের এক মধুর ধ্বনি প্রতিষ্ঠিত হলো।

এ সম্মান-তার জন্য ছিল অনন্য, অসাধারণ এবং ঐতিহাসিক।

সৌভাগ্যবান আবদুল্লাহ।

এতবড় গৌরব এবং সম্মানের পরও, আরো অনেকভাবে তিনি ছিলেন গৌরবান্বিত।

রাসূল (সা)-এর পরশে তিনি ছিলেন ধন্য।

তিনি ধন্য হয়েছিলেন– বদর, খন্দক, উহুদসহ অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও।

এসব যুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি সাহস, বীরত্ব আর ত্যাগের যে মহান পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাও এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

আবদুল্লাহ ছিলেন অর্থ-সম্পদের দিক থেকে অত্যন্ত অভাবী এবং দরিদ্র।

কিন্তু দরিদ্র হলে কি হবে?

মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন অনেক অনেক বেশি ধনী।

তার যেটুকু সম্পদ ছিল– সেটুকুই তিনি দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর পথে।

ইসলামের পথে।

রাসূল (সা)-কে ভালোবেসে।

তার সেই ভালোবাসা ছিল সমুদ্রের চেয়েও বিশাল।

বিশাল আর ব্যাপক ছিল আকাশের চেয়েও।

হযরত আবদুল্লাহ!

আবদুল্লাহ ছিলেন মূলত ইসলাম নামক বিশাল আকাশের সুদৃঢ়-মজবুত এক বিরল পুরুষ—শক্ত খিলান।◎

www.pathagar.com

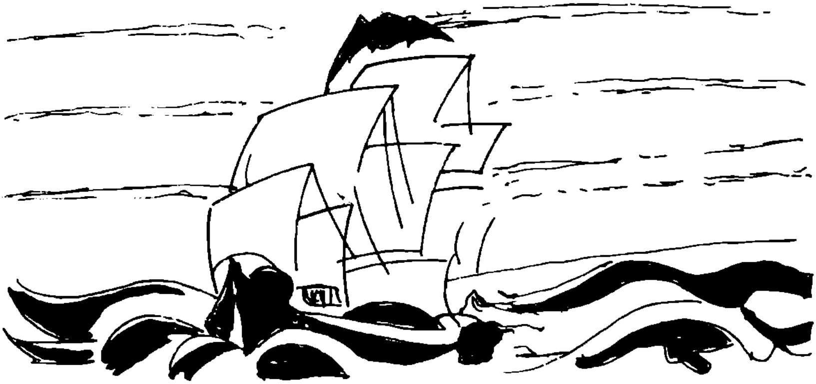

দুধ সাগরের দুরন্ত নাবিক

চারদিকে সাজ সাজ রব।

সাড়া পড়ে গেছে ঘরে ঘরে।

বাতাসেও ভেসে বেড়াচ্ছে সেই এক শানদার খবর।

মুখে মুখে ফিসফাস শব্দ, কতদূর ?

কতদূর হলো অপনার প্রস্তুতি ?

আমি তো প্রস্তুত। বললেন কেউ।

কেন নয় ? হতেই হবে। দেখছো না, রাসূল (সা)-ও শেষ করেছেন তাঁর যুদ্ধযাত্রার সকল প্রস্তুতি!

এমনটিই হয়েছিল সেদিন। যেন উৎসবে রূপ নিয়েছিল মদীনার প্রতিটি জনপদ।

কারণ– সামনেই যুদ্ধ। তাও ইতিহাসখ্যাত সেই উহুদ যুদ্ধ।

রাসূল (সা) একে একে শেষ করেছেন যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি।

www.pathagar.com

তিনিই তো সেনাপতি!

কত কিছু ভাবতে হয় তাঁকে।

খেয়াল রাখতে হয় কত শত দিক।

এবার যাত্রার পালা।

মদীনার প্রায় প্রতিটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সাহসী পুরুষ।

তাদের গন্তব্য উহুদ প্রান্তর।

কী যে সেই মনোরম দৃশ্য!

কাফেলা ছুটছে। বুকে তাদের সাহসের ঢল। চোখ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে সত্যের তেজ। এইতো জীবন! এইতো শান্তি! এই তো তৃপ্তির বৃষ্টি!

শহীদ হবার চেয়ে আর কোন্ স্বপ্ন আছে একজন সাহসী ঈগলের চোখে? তারা ছুটছেন। ছুটছেন শহীদের স্বপ্ন বুকে নিয়ে। রাসূল (সা)-এর সাথে।

রাসূল (সা)!

এই যুদ্ধের তিনিই মহান সেনাপতি।

আর রাসূল (সা) যেখানে সেনাপতি, সেখানে, সেই কওমে কে আর এমন নাদান আছে, যে যুদ্ধে যাবে না?

কে আর বঞ্চিত হতে চায় এমন সোনালি সুযোগ থেকে?

কী বিস্ময়কর ব্যাপার!

রাসূল (সা)-এর আহ্বানে যেন জোয়ার বয়ে গেল যুদ্ধে যাবার। সবাই রওয়ানা হবার পর মদীনার প্রতিটি মহল্লায় নেমে এলো অদ্ভূত নীরবতা।

চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। কেমন থমথমে। পোড়াবাড়ির মত। কোনো পুরুষের শব্দ নেই। তাদের পদভারে কাঁপছে না আর অলিগলি কিংবা প্রশস্ত পথ।

কি হলো? এমন হিম হিম ঠাণ্ডা কেন চারপাশ?

কোথায় গিয়েছে সব?

প্রশ্ন করলেই জবাব ভেসে আসে– উহুদ।

উহুদে গেছেন সকল পুরুষ। যুদ্ধের জন্যে। গেছেন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর মিথ্যার মূলোৎপাটন কর।

এ যে এক মহান আনন্দের ব্যাপার!

নিজেকে পূর্ণ করে তোলার এই তো মহান সময়।

আর সঠিক সুযোগ– পাথেয় সংগ্রহ করার।

www.pathagar.com

কোন্ পাথেয়? সেই যে আখেরাতের। কঠিন সময়ের জন্যে। খুবই কাজে আসবে সেদিন, আজকের এই সঞ্চয়।

সুতরাং যাদের কিছুটা বিবেক আছে, আছে যাদের সঠিক জ্ঞান, যারা প্রকৃতই চালাক-চতুর, তারা কি আর ফিরে নিতে পারে তাদের কল্যাণপ্রার্থী মুখ?

সেদিন ফিরে থাকতে পারেন নি অসংখ্য মুজাহিদ। তারা চলে গিয়েছিলেন উহুদে। রাসূল (সা)-এর সাথে।

কিন্তু—

কিন্তু একজন সেই মহান সুযোগ থেকে ছিলেন বঞ্চিত। তিনি তখনো বের হননি। বের হননি উহুদের পথে।

জিহাদ-সে তো পরের কথা। তখনো তিনি স্থিরই হতে পারেননি। বুঝতে সক্ষম হননি সত্য-মিথ্যার পবর্তসমান পার্থক্য।

জানতেন না, সত্য মানে সূর্য। সত্য মানেই আলোকিত–ঝলমলে দিন। আর মিথ্যা মানে ঘন কালো অন্ধকার। এত ঘন নিজের চেহারাও যায় না দেখা।

কী পীড়াদায়ক ব্যাপার!

আমার গোত্রের সবাই যখন চলে গেছেন জিহাদের ময়দানে, তখন-তখনো আমি ভীরু, কাপুরুষের মত বসে আছি ঘরের আঙিনায়?

ছি? কী লজ্জার বিষয়।

এমনটিই ভাবছেন আমর ইবনে সাবিত।

ভাবছেন আর নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন।

পুড়ে পুড়ে খাক হচ্ছে তার হৃদয়।

লজ্জায় আর অপমানে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার মুখ। না, এ হতেই পারে না! উঠে দাঁড়ালেন আমর।

একটু ভাবলেন। ভাবলেন, উহুদে যে যাব, আমি তো এখনো ইসলামই গ্রহণ করিনি।

কথাটি মনে হতেই শিউরে উঠলো তার সমগ্র শরীর।

শিউরে উঠলো। তারপর বিদ্যুৎগতিতে নেমে পড়লেন ঘর থেকে। সজ্জিত হলেন যুদ্ধসাজে। তারপর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন।

আমরের ঘোড়াটি ছুটছে তাকে বহন করে।

বাতাস কেটে কেটে।

www.pathagar.com

আঁধার দু'ভাগ করে।

উহুদের দিকে।

অন্য কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই আমরের। তিনি সোজা পৌঁছে গেলেন রাসূল (সা)-এর কাছে।

আমর! একি!

তাকে দেখেই গুঞ্জন শুরু হলো রাসূল (সা)-এর চারপাশে। তিনি তো এখনো মুসলমানই হননি! তিনি এখানে কেন? কোন মতলবে?

সবাই বিস্ময়ে হতবাক।

সবার চোখে মুখে উদ্বিগ্নের মাছি উড়লেও শান্ত, শান্ত এবং স্থির কেবল রাসূল (সা)-এর দৃষ্টি। সেই শান্ত স্থির দৃষ্টিতে এমন এক দ্যুতি ছিল যে উপস্থিত সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে।

কোনো ভূমিকা নয়। নয় কোনো বাহুল্য সংলাপ।

যেন সময় খুবই সংক্ষিপ্ত।

আমর এগিয়ে গেলেন রাসূল (সা)-এর কাছে।

খুবই কাছে।

বললেন, 'হে দয়ার নবী! হে আমার প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)! আমি এসেছি। আমি এসেছি যুদ্ধের ময়দানে। আপনার আহ্বানে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই আমার লক্ষ্য। আজ, এই সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী যুদ্ধে আমি অংশ নিতে চাই। যুদ্ধ করতে চাই সত্যের পক্ষে। এখন বলুন, বলুন হে দয়ার নবী (সা)! আমি কি আগে যুদ্ধ করবো, না কি মুসলমান হব?'

আমরের কথায় হাসলেন রাসূল (সা)।

তাঁর সেই হাসিতে সিক্ত হলো আমরের হৃদয়।

রাসূল (সা) বললেন, 'দু'টোই করবে তুমি। তবে আগে মুসলমান হও এবং তারপর যুদ্ধ কর।'

রাসূল (সা)-এর কথায় উজ্জীবিত হলেন আমর।

আবারো জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু হে দয়ার নবী! আমি তো সারাজীবনে এক রাকায়াত নামাযও আদায় করিনি। কী দুর্ভাগ্য আমার! কী বদনসীব! ধরুন এই অবস্থায় আমি যদি যুদ্ধে মারা যাই তাহলে? তাহলে সেটা কি আমার জন্যে ভালো হবে? সমাধান দিন, সমাধান চাই হে আমার প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)!'

আমরের প্রশ্ন শুনে একটু হাসলেন রাসূল (সা)। বললেন, 'হ্যাঁ, ভাল হবে। তুমি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হও এবং তারপর যুদ্ধ কর।'

www.pathagar.com

রাসূল (সা)-এর জবাব শুনে আশ্বস্ত হলো আমরের বুক।

প্রশান্ত হলো তার উত্তাল হৃদয়।

'ঠিক আছে, তাই হোক। তাহলে আর দেরি কেন?'

দেরি নয়। আমর সাথে সাথে পাঠ করলেন কালেমা তাইয়েবা। কালেমা পাঠ করে তিনি মুসলমান হলেন।

তারপর!

তারপর তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধের ময়দানে।

সদ্য ইসলাম কবুলকারী আমর।

বুকে তার সাত সাগরের ঢেউ। উথাল-পাতাল করা সাহসের ঝড়।

কেবলই দুলছেন তিনি।

দুলছেন শাহাদাতের স্বপ্নে। আহ! কী যে ভাল লাগছে তার! সামনেই আলোকিত পথ।

তিনি যুদ্ধ করছেন ইসলামের পক্ষে।

অসীম সাহসের সাথে।

তার তরবারির ধার দিয়ে ছিটকে বেরুচ্ছে ঈমানের আগুন।

যে আগুনে জ্বালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুশমনের মস্তক।

এগিয়ে যাচ্ছেন আমর।

ক্রমাগত সম্মুখে।

দুশমনদের ভিতরে।

আঘাত করছেন তিনি সজোরে। তিনিও জর্জরিত এবং রক্তাক্ত হচ্ছেন। খুন ঝরছে তার শরীর দিয়ে। শত্রুর তরবারির আঘাতে।

তা হোক। এ জন্য তো কেবল জীবনটাকে উৎসর্গ করেছি তার প্রতিই। যিনি একমাত্র মালিক আমার।

রক্তাক্ত শরীর নিয়ে আরও এগিয়ে যাচ্ছেন আমর।

এগিয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রান্তসীমার দিকে। এভাবে এক সময়, এক সময় নিস্তেজ, অসাড় হয়ে গেল আমরের দেহ।

যুদ্ধ শেষ।

যুদ্ধ শেষে শহীদের খোঁজে বের হলেন আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা। তারা খোঁজ করছেন, কে কোথায় শহীদ অবস্থায় পড়ে আছেন।

হঠাৎ তাদের চোখ গেল আমরের ওপর। একপাশে পড়ে আছেন তিনি। বিস্মিত হলেন তারা। ব্যাপার কি? আমাদের জানা মতে আমর তো এখনো

www.pathagar.com

মুসলমানই হননি। তবে? তবে কেন তিনি এই যুদ্ধের ময়দানে? শহীদদের মাঝখানে?

তারা আরো এগিয়ে গেলেন আমরের কাছে। দেখলেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চলছে ধীরগতিতে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি আপনার গোত্রের টানেই এখানে এসেছেন?'

মৃত্যু প্রায় সমাগত।

শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ।

তবু, তবুও তিনি ক্লান্ত ঠোঁটে হাসির ঢেউ তুলে বললেন, 'না! গোত্রের টানে আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি একজন মুসলামন হয়ে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ করতে এসেছি সত্যের পক্ষে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে। আল্লাহ্ আমার মালিক। আর রাসূল (সা)-ই আমার একমাত্র পথ প্রদর্শক।'

যুদ্ধের ময়দান থেকে বাড়িতে আনা হল আমরকে। খুব বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করলেন।

খবরটি দ্রুত পৌঁছে গেল মহান সেনাপতি— রাসূল (সা)-এর কাছে।

আমরের মৃত্যু সংবাদ শুনেই রাসূল (সা) বললেন, 'সে অল্পশ্রমে প্রচুর বিনিময় লাভ করেছে। নিশ্চিত সে জান্নাতীদের অন্তর্গত।'

পরবর্তীতে আবু হুরাইরাও জিজ্ঞেস করতেন তার ছাত্রদের, 'আচ্ছা, এমন এক ব্যক্তি, যিনি সোজা জান্নাতে চলে গেছেন, অথচ একদিনও নামায আদায় করেন নি, বলোতো, তিনি কে?'

তারা উত্তর দিতে না পারলে তিনি নিজেই জবাব দিতেন, 'সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি আবদুল আশহালের উসাইরাম তথা আমর ইবনে সাবিত ইবনে ওয়াকশ।'

কী সৌভাগ্যবান আমর!

সারাটি জীবন ছিলেন তিনি অন্ধকারের যাত্রী।

আর তিনিই কি না হয়ে গেলেন রাসূল (সা)-এর পরশে মুহূর্তেই দুধ সাগরের দুঃসাহসী, দুরন্ত নাবিক!◎

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘কবি মোশাররফ হোসেন খান’ —একটি ব্যাপক পরিচিত নাম। **‘কায়েস মাহমুদ’** ছদ্মনামে তিনি **‘কিশোর কণ্ঠ’** পত্রিকায় **‘সাহসী মানুষের গল্প’** শিরোনামে দীর্ঘদিন যাবত লিখছেন। সেখান থেকেই কয়েকটি গল্প এই গ্রন্থে সন্নেবিশিত করা হলো।

রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে তিনি চমৎকারভাবে গল্পাকারে উপস্থাপন করেছেন।

শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ-সরল এবং সাবলীল ভাষায় লেখা তার এই গল্পগুলো সব ধরনের পাঠককেই আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। —প্রকাশক